চারু ও কারুকলা

নবম ও দশম শ্রেণি

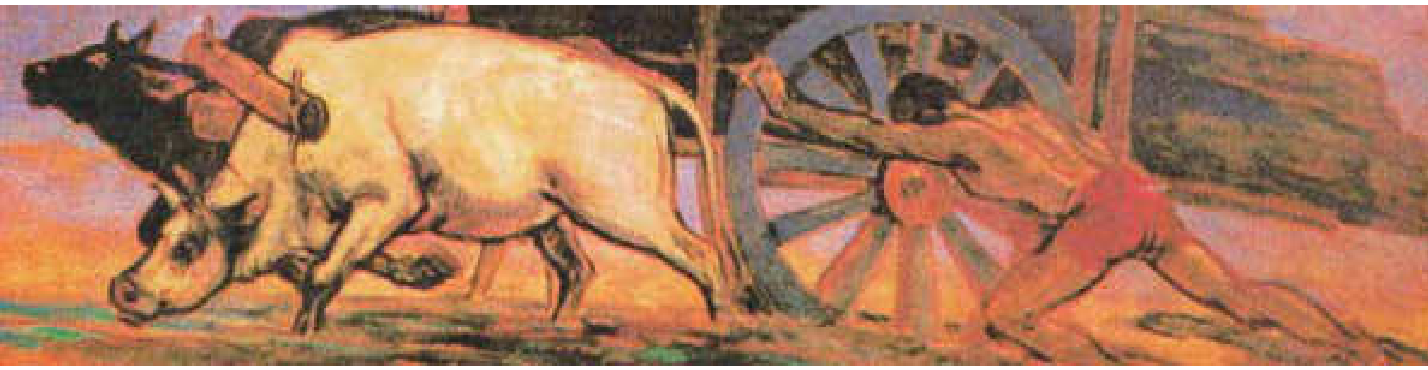

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড কর্তৃক ২০১৩ শিক্ষাবর্ষ থেকে
নবম ও দশম শ্রেণির পাঠ্যপুস্তকরূপে নির্ধারিত

চারু ও কারুকলা

নবম ও দশম শ্রেণি

২০২৫ শিক্ষাবর্ষের জন্য পরিমার্জিত

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড

৬৯-৭০, মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা-১০০০

কর্তৃক প্রকাশিত

[প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত]

প্রথম সংস্করণ রচনা ও সম্পাদনা

মুস্তাফা মনোয়ার

হাশেম খান

এডলিন মালাকার

এ.এস.এম. আতিকুল ইসলাম

সন্‌জীব দাস

প্রথম প্রকাশ : সেপ্টেম্বর, ২০১২

পরিমার্জিত সংস্করণ : সেপ্টেম্বর, ২০১৪

পরিমার্জিত সংস্করণ : অক্টোবর, ২০২৪

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক বিনামূল্যে বিতরণের জন্য

মুদ্রণে :

প্রসঙ্গ কথা

বর্তমানে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার উপযোগ বহুমাত্রিক। শুধু জ্ঞান পরিবেশন নয়, দক্ষ মানবসম্পদ গড়ে তোলার মাধ্যমে সমৃদ্ধ জাতিগঠন এই শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য। একই সাথে মানবিক ও বিজ্ঞানমনস্ক সমাজগঠন নিশ্চিত করার প্রধান অবলম্বনও প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা। বর্তমান বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিনির্ভর বিশ্বে জাতি হিসেবে মাথা তুলে দাঁড়াতে হলে আমাদের মানসম্মত শিক্ষা নিশ্চিত করা প্রয়োজন। এর পাশাপাশি শিক্ষার্থীদের দেশপ্রেম, মূল্যবোধ ও নৈতিকতার শক্তিতে উজ্জীবিত করে তোলাও জরুরি।

শিক্ষা জাতির মেরুদণ্ড আর প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার প্রাণ শিক্ষাক্রম। আর শিক্ষাক্রম বাস্তবায়নের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উপকরণ হলো পাঠ্যবই। জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০-এর উদ্দেশ্যসমূহ সামনে রেখে গৃহীত হয়েছে একটি লক্ষ্যাভিসারী শিক্ষাক্রম। এর আলোকে জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড (এনসিটিবি) মানসম্পন্ন পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন, মুদ্রণ ও বিতরণের কাজটি নিষ্ঠার সাথে করে যাচ্ছে। সময়ের চাহিদা ও বাস্তবতার আলোকে শিক্ষাক্রম, পাঠ্যপুস্তক ও মূল্যায়নপদ্ধতির পরিবর্তন, পরিমার্জন ও পরিশোধনের কাজটিও এই প্রতিষ্ঠান করে থাকে।

বাংলাদেশের শিক্ষার স্তরবিন্যাসে মাধ্যমিক স্তরটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। বইটি এই স্তরের শিক্ষার্থীদের বয়স, মানসপ্রবণতা ও কৌতূহলের সাথে সংগতিপূর্ণ এবং একইসাথে শিক্ষাক্রমের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অর্জনের সহায়ক। বিষয়জ্ঞানে সমৃদ্ধ শিক্ষক ও বিশেষজ্ঞগণ বইটি রচনা ও সম্পাদনা করেছেন। আশা করি বইটি বিষয়ভিত্তিক জ্ঞান পরিবেশনের পাশাপাশি শিক্ষার্থীদের মনন ও সৃজনের বিকাশে বিশেষ ভূমিকা রাখবে।

চারু ও কারুকলা শিক্ষা শিক্ষার্থীর মধ্যে প্রকৃতি, পরিবেশ, জীবন ও জীবনধারা ইত্যাদি সম্পর্কে পর্যবেক্ষণ ক্ষমতা বৃদ্ধি করে। চারু ও কারুকলা শিক্ষা অন্যান্য বিষয়ে শিক্ষাগ্রহণে যেমন, সাধারণ বিজ্ঞান, ভূগোল, চিকিৎসা বিজ্ঞান, প্রকৌশল বিজ্ঞান, স্থাপত্যকলা ইত্যাদি বিষয়ের প্রয়োগিক জ্ঞান ও দক্ষতা অর্জনে সহায়তা করে। এ শিল্পশিক্ষার মাধ্যমে শিক্ষার্থীর মধ্যে শৃঙ্খলাবোধ, পরিমিতিবোধ, সৌন্দর্যবোধ, দেশপ্রেম ও মানবিক মূল্যবোধের বিকাশ ঘটে এবং তারা হয়ে ওঠে সৃজনশীল।

পাঠ্যবই যাতে জবরদস্তিমূলক ও ক্লান্তিকর অনুষঙ্গ না হয়ে উঠে বরং আনন্দাশ্রয়ী হয়ে ওঠে, বইটি রচনার সময় সেদিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখা হয়েছে। সর্বশেষ তথ্য-উপাত্ত সহযোগে বিষয়বস্তু উপস্থাপন করা হয়েছে। চেষ্টা করা হয়েছে বইটিকে যথাসম্ভব দুর্বোধ্যতামুক্ত ও সাবলীল ভাষায় লিখতে। ২০২৪ সালের পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে প্রয়োজনের নিরিখে পাঠ্যপুস্তকসমূহ পরিমার্জন করা হয়েছে। এক্ষেত্রে ২০১২ সালের শিক্ষাক্রম অনুযায়ী প্রণীত পাঠ্যপুস্তকের সর্বশেষ সংস্করণকে ভিত্তি হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে। বানানের ক্ষেত্রে বাংলা একাডেমির প্রমিত বানানরীতি অনুসৃত হয়েছে। যথাযথ সতর্কতা অবলম্বনের পরেও তথ্য-উপাত্ত ও ভাষাগত কিছু ভুলত্রুটি থেকে যাওয়া অসম্ভব নয়। পরবর্তী সংস্করণে বইটিকে যথাসম্ভব ত্রুটিমুক্ত করার আন্তরিক প্রয়াস থাকবে। এই বইয়ের মানোন্নয়নে যে কোনো ধরনের যৌক্তিক পরামর্শ কৃতজ্ঞতার সাথে গৃহীত হবে।

পরিশেষে বইটি রচনা, সম্পাদনা ও অলংকরণে যাঁরা অবদান রেখেছেন তাঁদের সবার প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাই।

অক্টোবর ২০২৪

প্রফেসর ড. এ কে এম রিয়াজুল হাসান

চেয়ারম্যান

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

সূচিপত্র

অধ্যায়	বিষয়বস্তু	পৃষ্ঠা
প্রথম	শিল্পকলা	১–১০
দ্বিতীয়	দেশ-বিদেশের উল্লেখযোগ্য শিল্পী ও শিল্পকর্ম	১১–৩১
তৃতীয়	বাঙালি লোকজীবনে চারু ও কারুকলা	৩২–৪১
চতুর্থ	আঁকতে হলে জানতে হবে	৪২–৫৫
পঞ্চম	ব্যবহারিক শিল্পকলা	৫৬–৭৩
ষষ্ঠ	বাস্তব ও স্মৃতি থেকে অনুশীলন	৭৪–৭৯
সপ্তম	কারুকলা	৮০–১১২
	রঙিন ছবি	১১৩–১২০

প্রথম অধ্যায়

শিল্পকলা

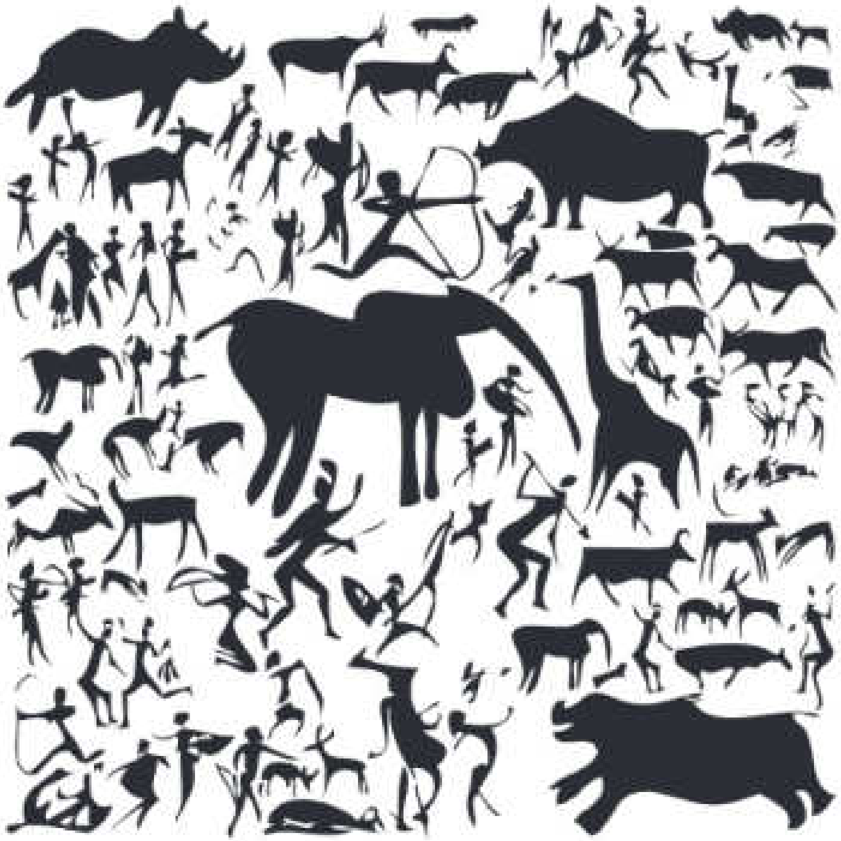

আদিম গুহাবাসী মানুষের হাত ধরেই শিল্পকলার যাত্রা শুরু

এ অধ্যায় পড়া শেষ করলে আমরা–

- শিল্পকলার উৎপত্তি সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারব।
- শিল্পকলার বিভিন্ন শাখা সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারব।
- শিল্পকলা চর্চার গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে পারব।
- শিল্পকলার অন্যতম মাধ্যম চারু ও কারুকলার গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে পারব।

পাঠ : ১

শিল্পকলা

শিল্পকলা সম্পর্কে ইতঃপূর্বে অষ্টম শ্রেণিতে তোমরা ধারণা পেয়েছ। শিল্পকলা বিষয়ে কিছু জানতে হলে প্রথমে এর উৎপত্তি বিষয়ে জানতে হবে। অর্থাৎ যখন থেকে গুহাবাসী মানুষ দলবদ্ধভাবে বসবাস শুরু করে বিভিন্ন পদ্ধতিতে একে অপরের সাথে যোগাযোগের মাধ্যম গড়ে তোলে তখন থেকেই শিল্পকলার যাত্রা শুরু। প্রকৃতির বৈচিত্র্য ও বিশালতা মানুষের মনে এক রহস্যময় অনুভূতির জন্ম দেয়। আদিম শিকারি মানুষ সেসব রহস্যের কূলকিনারা করতে না পেরে বিভিন্ন জাদু-বিশ্বাসে নির্ভরতা খুঁজেছে। সহজে পশু শিকার করার আশায় সেই জাদু-বিশ্বাস থেকেই গুহার দেয়ালে ধারালো পাথর বা পশুর হাড় দিয়ে খোদাই করে এঁকেছে পশু শিকারের বা পশুর নানারকম ছবি। এ ছবিগুলোই পৃথিবীর প্রথম শিল্পকলা।

এরপর সময়ের সাথে সাথে সভ্যতার অগ্রগতি হয়েছে। অর্থাৎ মানুষ প্রকৃতি ও পরিবেশকে তার আয়ত্তে এনে নিজের জীবনযাপনকে অনেক সহজ, সুন্দর ও সমৃদ্ধশালী করেছে। এভাবে যখন মানুষের জীবনের মৌলিক চাহিদাগুলো পূরণ করা অনেক সহজ হলো তখন তার মনের কিছু বিচ্ছু অনুভূতি ও কল্পনাশক্তি একত্রিত হয়ে শিল্পিত রূপ নিল। যেমন ভাষা আবিষ্কারের সাথে সাথে কবিতা, গল্প এসেছে। পরে উদ্ভব হয়েছে সংগীতের।

এই যে মানুষের মনের কল্পনা ও সৃজনশীলতার মিশ্রণে যা তৈরি হলো– ছবি, কবিতা, গান এ সবকে আমরা নাম দিয়েছি শিল্পকলা।

এক কথায় বলা যায়, মানুষের মনের সৃজনশীল কর্মকাণ্ডের সামগ্রিক রূপ হচ্ছে শিল্পকলা।

কাজ : জাদু-বিশ্বাসই পৃথিবীতে আদিম গুহাবাসী মানুষদের শিল্পকলার সূচনা করে। এই বক্তব্যের সপক্ষে তোমার খাতায় ১০টি বাক্য লেখো।

পাঠ : ২

শিল্পকলার শ্রেণিবিভাগ

সামগ্রিক শিল্পকলা আসলে অনেক শাখা-প্রশাখায় বিভক্ত। বহু তার মাধ্যম। আমাদের কাছে বিস্ময়ের ব্যাপার এই যে, শিল্পকলার প্রায় সকল মাধ্যমেরই শুরু করেছিল আদিম শিকারি মানুষেরা। বিস্ময়কর দক্ষতার সাথে প্রাচীন যুগের 'হোমো সাপিয়েন্স' মানুষ এঁকেছে বিভিন্ন বন্যপশুর ছবি। তারা অত্যন্ত পর্যবেক্ষণশীল ছিল। জীবজন্তু সম্পর্কে চমৎকার জ্ঞান তাদের ছিল এবং পাথর কিংবা হাড়ের উপর নির্ভুল সূক্ষ্ম রেখা অঙ্কন করে তা ফুটিয়ে তুলতে পারত। তাদের আঁকা ছবি দেখে প্রতিটি বস্তুকে সহজেই চিহ্নিত করা যায়। এমন চিত্র আছে যেখানে জীবজন্তুর আকারে অঙ্কনরত মানুষের ছবিও আছে। মাথার উপর শিং এবং পিছনে লেজ পরিহিত মানুষের ছবি আছে। হরিণের সাজে সজ্জিত মানুষটি হরিণের অঙ্গভঙ্গি নকল করে দুপা উপরে তুলে লাফ দিচ্ছে। তাদের আঁকা ছবি থেকেই জানা যায় যে, আদিম মানুষ শিকার করা পশুকে সামনে রেখে তার চারপাশ ঘিরে বিভিন্ন অঙ্গভঙ্গি ও চিৎকার করে লাফাতে লাফাতে আনন্দ প্রকাশ করত। সেখান থেকেই মানুষের নৃত্য-গীতির শুরু। শিকার করা বন্যপশুর লোমশ চামড়া, শিং, ইত্যাদি পরিধান করে তারা ঐ পশুর অনুকরণ করে হাঁটা, লাফানো, দৌড়ানো ইত্যাদির অভিনয় করত। ধারণা করা হয় পশুর পালকে ধোঁকা দিয়ে

তাদের সাথে মিশে থেকে সহজে শিকার করার কৌশল হিসেবে তারা এসব করত। সেখান থেকেই মানুষের অভিনয় শিল্পের শুরু। যদিও আদিম মানুষ এ সবই করেছে তাদের বাঁচার তাগিদে, খাদ্য সংগ্রহের প্রয়োজনে।

> কাজ : গুহার দেয়ালে আদিম মানুষের আঁকা পশুর ছবিগুলোর আকৃতি ও অঙ্গভঙ্গি অনেক নির্ভুল ছিল। কী কারণে তারা এত নির্ভুলভাবে জীবজন্তুর ছবি আঁকতে পারত বলে তুমি মনে কর, তা খাতায় লেখো।

পাঠ : ৩

শুধু ছবি আঁকা নয়, প্রস্তর যুগের মানুষ মূর্তিও তৈরি করত। যাকে বলা হয় ভাস্কর্য। সে সব ভাস্কর্যের বেশিরভাগই ছিল মানুষের মূর্তি এবং প্রায় সবই নারীমূর্তি। আদিম সমাজ ছিল মাতৃতান্ত্রিক। মেয়েরাই ছিল দলের প্রধান। মাকে মনে করা হতো দলের আদি সত্তা। অর্থাৎ তার থেকেই দলের উদ্ভব হয়েছে। তাই মাতৃসত্তার প্রতীক হিসেবে তারা এসব নারীমূর্তি তৈরি করেছিল। কখনো পাহাড়ের গায়ে আঁচড় কেটে আবার কখনো আলাদা পাথর কেটে তারা এগুলো তৈরি করত। এছাড়া বাইসনের শিং, পশুর হাড় কিংবা পাথর প্রভৃতি দিয়ে পশু-পাখির মূর্তিও তারা তৈরি করত। নানারকম মৃৎপাত্র অর্থাৎ মাটির তৈরি পাত্র তারা তৈরি করত এবং বিভিন্ন রকম হাতিয়ার তৈরি করে তাতে নানারকম কারুকার্য করত। এমনকি মাছের মেরুদণ্ডের হাড়, ঝিনুক ও হরিণের দাঁত দিয়ে গয়না বানিয়ে তা ব্যবহার করত আদিম মানুষ। অর্থাৎ কারুশিল্পের সূচনাও তারা করেছিল। পশুর হাড়, চামড়া, কাঠ, খাগড়া, পাথর কিংবা কাদামাটি দিয়ে শুরু হয় ঘরবাড়ি তৈরির প্রথম প্রচেষ্টা। সেখান থেকেই স্থাপত্যকলার শুরু। এভাবে মানুষের অর্জিত ও চর্চিত শিল্পকলার প্রায় সকল শাখার সূত্রপাত আদিম মানুষের হাতেই ঘটেছিল, যেমন– চিত্রকলা, কারুশিল্প, ভাস্কর্য, মৃৎশিল্প, স্থাপত্যশিল্প, নৃত্য, সংগীত, অভিনয় এ রকম অনেক শিল্প মাধ্যম।

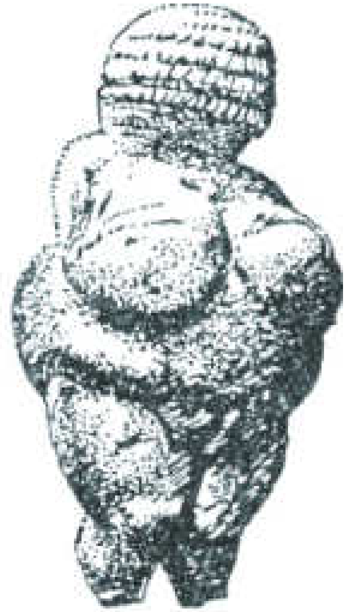

নারীমূর্তি বা মাতৃসত্তা ও উর্বরতার প্রতীক

> কাজ : পুরো শ্রেণির শিক্ষার্থীরা ৫/৬ জনের একেকটি দলে ভাগ হয়ে প্রতিদল নিজেদের মধ্যে আলোচনার মাধ্যমে খাতায় নিচের বাক্যটির ব্যাখ্যা লেখো।

আজকের শিল্পকলার প্রায় সকল শাখার সূচনা আদিম মানুষের হাতে।

পাঠ : ৪

অষ্টম শ্রেণিতে আমরা জেনেছি যে, সমগ্র শিল্পকলা মূলত প্রধান দুটি ধারায় বিভক্ত। একটি হচ্ছে চারুশিল্প বা Fine Arts এবং অন্যটি হচ্ছে কারুশিল্প বা Crafts। চারুশিল্প বলতে আমরা সেসব শিল্পকেই বুঝি যা মানুষের সৃজনশীল মনের স্বতঃস্ফূর্ত বহিঃপ্রকাশ। অর্থাৎ সৃষ্টির আনন্দে মনের তাগিদেই তার উৎপত্তি। আমাদের দৃষ্টি ও মনকে আনন্দ দেয়াই তার উদ্দেশ্য। মানুষের মনের নানা অনুভূতি, সুখ, দুঃখ, আনন্দ, বেদনা এবং আরও নানামুখী অনুভব থেকে চারুশিল্প সৃষ্টি হয়।

২০২৫

অন্যদিকে কারুশিল্প তৈরি হয়, মানুষের ব্যবহারিক প্রয়োজন মাথায় রেখে। অর্থাৎ কারুশিল্প যদিও শিল্প তবু তা কেবল মানুষকে আনন্দ দেবার জন্য বা দৃষ্টিকে আনন্দ দেবার জন্য তৈরি হয় না, এ শিল্প মানুষের ব্যবহারিক কাজে প্রয়োজন হয়। দৈনন্দিন জীবনে বিভিন্নভাবে বিভিন্ন প্রয়োজনে আমরা কারুশিল্পের ব্যবহার করি। তবে মানুষের সৃষ্ট সকল প্রকার শ্রেষ্ঠ শিল্পই চারুশিল্পের অন্তর্গত। নিচে একটি ছকের সাহায্যে শিল্পকলার বিভিন্ন শ্রেণিবিভাগ দেখানো হলো :

কাজ : ক্লাসের শিক্ষার্থীরা বিভিন্ন দলে ভাগ হয়ে পরস্পর আলোচনার মাধ্যমে ললিতকলার বিভিন্ন শাখাগুলোতে বাংলাদেশের তিনজন করে বিশিষ্ট শিল্পীর নাম লেখো। দেখা যাক কোন দল সবকটি শাখার শিল্পীদের নাম লিখতে পারে।

পাঠ : ৫

বর্ণিত ছকে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, শিল্পকলাকে প্রধানত দুটি ভাগে ভাগ করা হয়েছে।

(১) চারুশিল্প (২) কারুশিল্প।

চারুশিল্পকে আবার ললিতকলা, মানবিক কলা, নাটক, কাব্যসাহিত্য ও গদ্যসাহিত্যে ভাগ করা হয়েছে। এর মধ্যে ললিতকলা একটি গুরুত্বপূর্ণ ভাগ। এই ভাগের কয়েকটি শাখা আছে। যেমন– চিত্রকলা, ভাস্কর্য, খোদাইশিল্প, সংগীত, নৃত্য ও নৃত্যনাট্য।

অন্যদিকে শিল্পকলার অপর ধারা কারুশিল্পের শাখাগুলো হচ্ছে– মৃৎশিল্প, বুনন,তাঁতশিল্প, বাঁশ, বেত ও কাঠের তৈরি শিল্প, চর্ম বা চামড়ার তৈরি বিভিন্ন পণ্য, গহনা, বিভিন্ন ধাতুর তৈরি শৈল্পিক তৈজসপত্র, গৃহস্থালি সামগ্রী, হাতিয়ার ইত্যাদি। এ ছাড়াও কারুশিল্পের ধারায় তৈরি আরও কিছু শিল্প আছে, যেগুলোকে আমরা লোকশিল্পরূপে চিহ্নিত করে থাকি। যেমন– পটচিত্র, মাটির ও কাঠের তৈরি বিভিন্ন খেলনা হাতি, ঘোড়া, মানুষ, পাখি। পোড়ামাটির ফলকচিত্র, নকশিকাঁথা, নকশি পাতিল বা শখের হাঁড়ি ইত্যাদি। সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, শিল্পকলার প্রধান দুই ধারার বিভিন্ন শাখা– প্রশাখা মিলিয়ে এর জগৎ অনেক বড়ো ও বিস্তৃত।

কাজ : একটি ছকের মাধ্যমে শিল্পকলার প্রধান দুটি ধারা এবং এর শাখা-প্রশাখাগুলো দেখাও।

পাঠ : ৬

শিল্পকলা চর্চার গুরুত্ব

আদিম যুগের সেই বন্য, লোম ও দাড়িওয়ালা গুহাবাসী মানুষদের আঁকা ছবিই পৃথিবীর সবচেয়ে পুরোনো শিল্পকলা এ কথা আমরা আগেই জেনেছি। যারা এ ছবিগুলো এঁকেছে, হাজার হাজার বছর আগে তারা পৃথিবী থেকে বিদায় নিয়েছে। কিন্তু তাদের আঁকা ছবিগুলো এখনো টিকে আছে। আর শুধু টিকে আছে বললে ভুল হবে। সেইসব ছবিগুলো, আদিম মানুষদের তৈরি বিভিন্ন মূর্তি, পাত্র ও হাতিয়ার আমাদের সামনে মেলে ধরে আছে ইতিহাসের এক অজানা অধ্যায়। ভেবে দেখো তখন ভাষা পর্যন্ত আবিষ্কার হয়নি, লিপির আবিষ্কার তো দূরের কথা। সুতরাং তখনকার কোনো লিখিত ইতিহাস তো আর পাওয়া যাবে না। কিন্তু আদিম গুহাবাসী সেসব মানুষদের জীবনযাপন, আচার-ব্যবহার, পোশাক-পরিচ্ছদ এসব কিছু না জানলে তো মানব জাতির ইতিহাস অসম্পূর্ণ থেকে যেত। লিখিত ইতিহাস আমরা পাইনি বটে, কিন্তু তাদের করা ঐ শিল্পকর্মগুলোই আজ ইতিহাসের সাক্ষী। শিল্পকর্মগুলো দেখে, ছবি দেখে আমরা আদিম মানুষের জীবন সংগ্রাম, পোশাক-পরিচ্ছদ, তাদের চিন্তা, বিশ্বাস সবই জানতে পেরেছি।

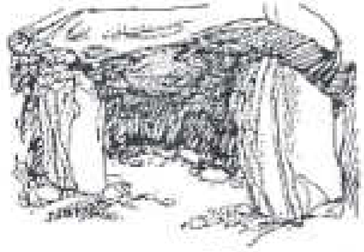

প্রথম ঘরবাড়ি

সবচেয়ে পুরোনো মৃৎপাত্র

স্মৃতিস্তম্ভ 'ডলমেন'

এভাবে আদিম যুগের পরে পুরোনো প্রস্তর যুগ বা পুরোনো পাথর যুগ, নতুন পাথরের যুগ, কৃষিযুগ প্রভৃতি সভ্যতার সবগুলো পর্যায়কেই আমরা জেনেছি মানুষের বস্তুগত সংস্কৃতির নিদর্শন থেকে। অর্থাৎ ঐ সভ্যতার মানুষ সেসব হাতিয়ার, বাসনপত্র, পোশাক-পরিচ্ছদ, গয়নাগাটি ইত্যাদি ব্যবহার করত তা থেকে। মানুষের ব্যবহৃত ঐসব সামগ্রীকেই এখন আমরা কারুশিল্প বলে থাকি। সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, মানব সভ্যতা ও শিল্প হাত ধরাধরি করে এগিয়েছে, তাই বলা হয় শিল্পের বয়স মানবসভ্যতার সমান। ঐ সমস্ত শিল্পকলার মাধ্যমে আমরা মানুষের সভ্যতার ইতিহাসকে জানতে পেরেছি। এ থেকেই আমরা শিল্পকলা চর্চার গুরুত্ব উপলব্ধি করতে পারি।

পাঠ : ৭

কোনো সমাজ, দেশ বা জাতির পরিচয়কে আমাদের সামনে তুলে ধরে তাদের শিল্প ও সংস্কৃতি। শিল্প একটি বিশেষ সময়কেও ধরে রাখে। যার থেকে আমরা ঐ সময়ের অনেক উপাদানকে পেয়ে যাই। যেমন মিশরীয় চিত্রকলা। মিশরীয়রা ছবি আঁকত মন্দিরে অথবা পিরামিডের ভিতরে। পিরামিড হচ্ছে রাজা, বাদশা বা বড়োলোকদের কবর ঘর। ত্রিভুজ আকৃতির বিশাল বিশাল পাথরের তৈরি বিরাট বিরাট সমাধি। এর ভিতরের

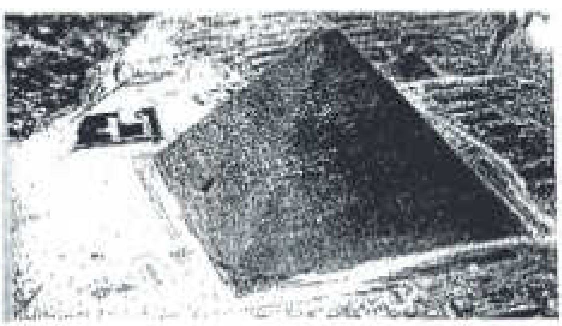

মিশরের সবচেয়ে বড়ো পিরামিড 'গির্জা'- উচ্চতা ৪৮০ ফুট

২০১৫

দেয়ালে, মৃতের কফিনে, মন্দিরে মিশরীয়রা হাজার হাজার ছবি আঁকত। সবটুকু জায়গা ছবি দিয়ে ভরে দিত। একটুও ফাঁকা রাখত না। এসব ছবিতে কিছু কিছু গৃহপালিত জীবজন্তুর ছবি থাকলেও বেশিরভাগই থাকত নারী, পুরুষ, রাজা, রানি ও দেব-দেবীর ছবি। তাদের অধিকাংশ ছবিই গল্প বলা ছবি। অর্থাৎ ছবিগুলো দেখলেই এর ঘটনা বোঝা যায়। কখনো কখনো ছবির সাথে তাদের ভাষায় এর ব্যাখ্যাও থাকত। এসব ছবিগুলো দেখেই আজকে আমরা মিশরীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির কথা জানতে পারি। ঐ সময়ে তাদের পোশাক-পরিচ্ছদ, রাজা-রানি, জনগণ ও তাদের জীবনযাত্রা, নিয়ম-কানুন, আচার-বিশ্বাস সবই বলে দেয় ঐ ছবিগুলো আর তাদের ব্যবহৃত বিভিন্ন কারুশিল্পসামগ্রী। পিরামিডগুলোও মিশরীয় স্থাপত্যের বিস্ময়কর নিদর্শন। মূলত মিশরীয় শিল্পকলাই আমাদের সামনে তার অতীত ঐতিহ্য ও ইতিহাসকে হাজির করেছে।

কাজ : পিরামিড সম্পর্কে তোমার ধারণা-১০টি বাক্যে লেখো। পাশে পিরামিডের একটি ছবি আঁকো।

পাঠ : ৮

অজন্তা গুহার দেয়ালে রিলিফ ভাস্কর্য

শিল্পকলা ও স্থাপত্যের চমৎকার নিদর্শন আমরা গ্রিসে এবং ভারতবর্ষে পাই। মধ্যযুগের গ্রিস ও ভারতবর্ষের সাহিত্যকর্ম সারা বিশ্বের অহংকার। ইলোরা ও অজন্তার গুহাচিত্র প্রাচীন ভারতীয় শিল্পকলাকে আমাদের সামনে তুলে ধরে। পালযুগের পুথিচিত্র বা মোগল চিত্রকলা আমাদের সামনে ভারতের সামাজিক ও রাজনৈতিক ইতিহাসের অনেক কিছুকেই প্রকাশ করেছে। পাশাপাশি ঐ সময়ের বিভিন্ন ভাস্কর্য ও বিভিন্ন স্থাপনা অর্থাৎ স্থাপত্যশিল্প ভারতবর্ষের অহংকার। আগ্রার তাজমহল পৃথিবীর বিস্ময়। তাই শিল্পকলা চর্চার গুরুত্ব অপরিসীম। মানব সভ্যতা এগিয়েছে মূলত মানুষের সৌন্দর্যবোধকে কেন্দ্র করেই। গুহাবাসী মানুষ যখন গাছ, পাতা, পশুর হাড়, চামড়া, ডালপালা দিয়ে ঘর বানানো শিখল তখন থেকে স্থাপত্যকলা আজকের অবস্থানে এসেছে শুধু মানুষের নিত্যনতুন সৌন্দর্যবোধের কারণে। মানুষ চেয়েছে তার তৈরি ভবনকে শিল্পিতরূপে দেখতে। তাকে আরো সুন্দর করতে। পোশাকের ব্যাপারেও একই কথা প্রযোজ্য। শুধু লজ্জা নিবারণের জন্য আদিম মানুষের গাছের ছাল, পাতা বা পশুর চর্মইতো যথেষ্ট ছিল। কিন্তু আজকে নিত্যনতুন ফ্যাশনের পোশাক আমরা পরিধান করছি। বাজারে গিয়ে আরও নতুন নতুন ডিজাইন খুঁজছি। এসবই শিল্পের প্রতি, সৌন্দর্যের প্রতি আমাদের আকর্ষণের কারণে। নিজের দেশ ও সংস্কৃতিকে সমৃদ্ধ করার জন্য, মানুষের রুচি, সৌন্দর্যবোধ ও জাতীয় ঐতিহ্যের বিকাশে শিল্পকলার চর্চা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। ছবি আঁকা ও শিল্পকর্ম যেমন-সংগীত, চলচ্চিত্র বা সাহিত্যকর্মের মাধ্যমে মানুষের সৃজনশীল প্রতিভার বিকাশ ঘটে, মানুষের মানবিক গুণাবলি বিকশিত হয়। সমাজকে সুন্দর করার জন্য, সুন্দরভাবে বাঁচার জন্য, আনন্দে থাকার জন্য এবং নিজেকে ও নিজের অনুভূতিকে প্রকাশ করার জন্য ছবি আঁকা, শিল্পকর্মের চর্চা করা একটি প্রয়োজনীয় কাজ। এ কথাটা শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিন এবং তাঁর সাথিরা এ দেশের মানুষকে বোঝাতে পেরেছিলেন বলেই আজ শিল্পকলার চর্চা আমাদের দেশে এত গুরুত্ব পাচ্ছে।

কাজ : শিল্পকলা চর্চার মাধ্যমে আমরা নিজের দেশ ও দেশের সংস্কৃতিকে পৃথিবীর সামনে তুলে ধরতে পারি। ছবি ও ভাস্কর্য ছাড়া শিল্পকলার আর কোন কোন মাধ্যমে, কীভাবে তা সম্ভব বলে মনে করো?

পাঠ : ৯

ছবি আঁকা বা অন্যান্য শিল্পকর্ম মানুষের জীবনকে সুন্দরভাবে গড়ে তুলতে সাহায্য করে। তাই খুব ছোটোবেলা থেকে কোনো শিশুকে যদি ছবি আঁকার প্রতি আগ্রহী করে তোলা যায়, তাহলে শিশু লেখাপড়ার উন্নতির সাথে সাথে তার রুচিবোধের জ্ঞান উন্নত করতে পারবে। সুন্দর কী ও অসুন্দর কী তা সহজে বিচার করে তার কাজে সুরুচির পরিচয় দিতে পারবে। ছবি আঁকা ও অন্যান্য শিল্পকলা চর্চার মাধ্যমে একজন মানুষের মধ্যে অনেক গুণের বিকাশ ঘটানো সম্ভব।

খাতার একটা ছোটো কাগজে একটি শিশু যখন গ্রামের ছবি আঁকে তখন ঐ ছোটো কাগজটিতে সে পুরো গ্রামের সবকিছুকে ধরতে চায়, যেমন–গ্রামের ঘরবাড়ি, গাছপালা, নদী–নৌকা, মানুষজন, গরু, ছাগল, ফুল, পাখি সবকিছু। কাগজটিতে কোথায় ঘরবাড়ি হবে, গাছপালা কোথায় থাকবে, নদীটি কোথা দিয়ে বয়ে যাবে, নৌকা কয়টি থাকবে, কোথায় থাকলে ভালো লাগবে, নদীর পাড়ে ফসলের মাঠ, বাড়ির উঠানে গরু, মেয়েরা নদী থেকে পানি নিয়ে ফিরছে এ রকম অনেক বিষয়কে সুন্দর করে সাজিয়ে শিশুটি গ্রামের ছবি ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করে। ছোটো একটা সাদা কাগজে এতবড়ো একটি গ্রামকে আঁকতে গিয়ে শিশুটির মধ্যে ছোটো জায়গায় সীমিত পরিসরে সবকিছুকে সাজিয়ে রাখার, সুন্দর করে গুছিয়ে নেবার ও শৃঙ্খলাবোধের চর্চা হয়। এরপর রং করার ক্ষেত্রেও কোথায় কী রং দিলে সুন্দর হবে, প্রকৃতিতে কোনটির কী রং এসব নিয়ে শিশুটি ভাবে। এতে তার দেখার ক্ষমতা, চিন্তার শক্তি, সুন্দরের প্রতি আকর্ষণ সবই বৃদ্ধি পায়। ফলে এভাবে ছবি আঁকতে আঁকতে এক সময় তার মধ্যে সৌন্দর্যবোধ, মানবিক গুণাবলি ও মানুষের প্রতি মমত্ববোধ যেমন বৃদ্ধি পায়, তেমনি সুন্দর কাজ, ভালো কাজ করার ব্যাপারে সে উদ্যমী ও সাহসী হয়ে গড়ে ওঠে। পরিণত বয়সে সে কোনো দায়িত্ব গ্রহণ করতে ভয় পায় না। ধরা যাক সে কোনো একটি প্রতিষ্ঠানের পরিচালক হলো, যে প্রতিষ্ঠানে শত শত কর্মী কাজ করে। সে কিন্তু সুশৃঙ্খল ও সুন্দরভাবে প্রতিষ্ঠানটি চালাতে পারবে। যার যার কাজ ও দায়িত্ব সুষ্ঠুভাবে বণ্টন করা তার জন্য সহজ হবে। কারণ ছোটোবেলায় ছবি আঁকা চর্চার মাধ্যমে এ গুণ সে আয়ত্ত করেছে। ছবি আঁকা খুব সহজে মানুষকে সুনাগরিক হিসেবে গড়ে তোলে। এজন্য উন্নত বিশ্বে বহু আগে থেকেই লেখাপড়ার অন্যান্য বিষয়ের পাশাপাশি ছবি আঁকাকে আবশ্যিক বিষয় হিসেবে গণ্য করা হয়।

পাঠ : ১০

শিল্পকলার গুরুত্বপূর্ণ অংশ : চিত্রকলা ও কারুকলা

সামগ্রিক শিল্পকলার জগতে চিত্রকলা বা ভাস্কর্য তৈরি এবং কারুকলা একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। আমাদের সমাজজীবনেও বিভিন্ন ক্ষেত্রে চিত্রকলা ও কারুকলার অসীম গুরুত্ব রয়েছে। সমাজে বিভিন্ন কর্মক্ষেত্রে চিত্রশিল্পী ও কারুশিল্পীরা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। যেসব কর্মক্ষেত্রে শিল্পীরা পেশা হিসেবে শিল্পকর্ম করে যাচ্ছে তা হলো গ্রামের পেশাজীবী কারুশিল্পীর কাজ; যেমন– কামার, কুমার, তাঁতি, স্বর্ণকার, সুতার ও বাঁশ–বেতের কারুশিল্পী। মেয়েদের তৈরি নকশিকাঁথা, শীতলপাটি, জায়নামাজ, শতরঞ্জি, পাখা ইত্যাদি ছাড়াও বুনন ও সূচিশিল্পের মাধ্যমে যুগ যুগ ধরে বংশপরম্পরায় গ্রামের সাধারণ মানুষের মধ্যে এসব শিল্পকর্মের চর্চা আছে। যাকে আমরা নাম দিয়েছি লোকশিল্প, কারুশিল্প ও কুটিরশিল্প। বর্তমান আধুনিক জীবনযাপনে লোকশিল্প, কারুশিল্প ও কুটিরশিল্পের প্রতি মানুষের আগ্রহ বেড়েছে।

২০২৫

আধুনিক জীবনযাপনে ও বিভিন্ন কর্মক্ষেত্রে শিল্পীরা দায়িত্বপূর্ণ কাজ করে যাচ্ছেন। বইপুস্তক ও পত্রপত্রিকার জন্য শিল্পী প্রয়োজন। শিক্ষাক্ষেত্রে বিশেষ করে প্রকৌশলবিদ্যা, চিকিৎসাবিদ্যা স্থাপত্যশিক্ষায় নানারকম বিজ্ঞান চর্চা, ইতিহাস, ভূগোল চর্চায় চিত্রশিল্পের অনেক গুরুত্ব রয়েছে। টেলিভিশনের প্রতিটি অনুষ্ঠান নির্মাণের জন্য ডিজাইনারের প্রয়োজন। নাটক, সিনেমা তৈরিতে সেট ডিজাইনার বা অঙ্কনশিল্পী ছাড়া সম্ভব নয়। বিভিন্ন ইন্ডাস্ট্রিয়াল ডিজাইনের জন্য যেমন–বিমান তৈরিতে, জাহাজ নির্মাণে, মোটরগাড়ি, বাস, ট্রেন, টেলিভিশন, রেডিও, তৈজসপত্র, তালা, চাবি, বৈদ্যুতিক বাতি, ফ্যান, বোতল, বৈয়ম, কৌটা থেকে শুরু করে কলম, পেনসিল, ছুরি, কাঁচি বিভিন্ন আসবাবপত্রের সুন্দর চেহারা, রূপ ও গড়ন বা আকার–আকৃতি তৈরির জন্য চিত্রশিল্পীর একান্ত প্রয়োজন। বিভিন্ন জিনিসপত্রের মোড়ক ও বিজ্ঞাপন, পোস্টার প্রভৃতি বিজ্ঞাপনী শিল্পের জন্য চিত্রশিল্পী প্রয়োজন। পোশাক বা ফ্যাশন ডিজাইনের জন্যও চিত্রশিল্পী ছাড়া চলে না। তাই শিল্পকলার চর্চা অত্যন্ত প্রয়োজন এবং চিত্রকলা ও কারুকলার চর্চা খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

বিভিন্ন প্রকার কারুশিল্প

পাঠ : ১১

এর আগের আলোচনায় আমরা শিল্পকলার বিস্তৃত ও নানামুখী বিষয় সম্পর্কে জেনেছি। চিত্রকলা, ভাস্কর্য ও কারুশিল্প হাজার বছর ধরে বিশ্বের শিল্পভান্ডারকে সমৃদ্ধ করেছে। যেসব শিল্পকর্ম ও শিল্পীরা তাঁদের কাজের মাধ্যমে এক্ষেত্রে অবদান রেখেছে তাঁদের সম্পর্কে সংক্ষেপে আমরা ৬ষ্ঠ, ৭ম ও ৮ম শ্রেণিতে জেনেছি। চীমাবুয়ে, জত্তো থেকে বতিচেল্লি, পেরুজীনো, রাফায়েল, মাইকেল অ্যাঞ্জেলোসহ শুধু ইতালিতেই জন্মেছিলেন বহু কালজয়ী শিল্পী। ভ্যাটিকান সিটিতে সিস্টিন গির্জার ছাদের নিচে বাইবেলের ঘটনাবলি নিয়ে মাইকেল অ্যাঞ্জেলো যে ছবি এঁকেছেন, তা বিশ্বশিল্পকে দিয়েছে অতুলনীয় সম্পদ। ছাদের নিচে মাচা বেঁধে টানা সাড়ে চার বছর চিত হয়ে শুয়ে শুয়ে এ কাজ তিনি শেষ করেন। মাইকেল এ অ্যাঞ্জেলো মূলত ছিলেন খ্যাতিমান ভাস্কর। গির্জার ছবিটি যখন শেষ হলো তখন গোটা রোমের লোক ফেটে পড়ল তা দেখার জন্য। আজও সারা বিশ্বের হাজার হাজার শিল্পপ্রেমিক রোমের সিস্টিন গির্জায় ঐ ছবি দেখার জন্য ছুটে যায়। আরেকজন বিখ্যাত শিল্পী লিওনার্দো–দা–ভিঞ্চি, তিনিও ইতালিতে জন্মান। তাঁর আঁকা মোনালিসা পৃথিবী বিখ্যাত। বর্তমানে ফ্রান্সের প্যারিস শহরের ল্যুভর মিউজিয়ামে সংরক্ষিত আছে ছবিটি।

শ্রেষ্ঠ শিল্পীদের আরেকজন হচ্ছেন রেমব্রান্ট। তাঁর বিখ্যাত ছবি রাতের পাহারা। বিখ্যাত অন্য একজন শিল্পী পল সেজান। তাঁর প্রাকৃতিক দৃশ্যের ছবি দেখে মনে হবে ছবির মধ্যে ঢুকে আমরা তাঁর মাঠে, ঘাটে, পাহাড়ে বেরিয়ে

পড়ি। তোমরা অনেকেই হয়তো ভ্যানগগের নাম শুনেছ। তাঁর জন্ম হল্যান্ডে। ফরাসি শিল্পী পল গগাঁ ও ভ্যানগগ একসাথে কিছুদিন ছবি আঁকেন। তাঁরা দুজনেই চিত্রশিল্পের ইতিহাসে বিখ্যাত। আরেক শিল্পী মাতিস। তাঁর একটি বিখ্যাত ছবি—নাচ। বিশ শতকের সেরা শিল্পীদের অন্যতম হচ্ছেন-পাবলো পিকাসো। শিশু ও পায়রা, মা ও শিশু, স্বপ্ন, পায়রা, গুয়ের্নিকা ইত্যাদি তাঁর বিখ্যাত ছবি। অন্যদিকে আধুনিক ভাস্কর্যের জনক অগাস্টিন রদ্যাঁ এবং হেনরি মুরসহ বিভিন্ন ভাস্কর তাঁদের ভাস্কর্য দিয়ে সমৃদ্ধ করেছেন শিল্পের ভুবনকে। আমাদের ভারতীয় উপমহাদেশের খ্যাতিমান শিল্পীরাও বিশ্বশিল্পে তাঁদের অবদান রেখেছেন। অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, নন্দলাল বসু, যামিনী রায়, আব্দুর রহমান চুঘতাই, আমাদের দেশের জয়নুল আবেদিন, কামরুল হাসান, এস.এম. সুলতান, শফিউদ্দিন আহমেদ প্রমুখ শিল্পীর কাজেও চারুকলার ভুবন সমৃদ্ধ হয়েছে।

অন্যদিকে কারুকলাও সারা বিশ্বের বিভিন্ন দেশে দেশে নিজ নিজ বৈশিষ্ট্য নিয়ে সমৃদ্ধ করেছে শিল্পকলার ভুবনকে।

বিশ্বশিল্পের এই বিশাল চিত্রকলার ভান্ডার এত সমৃদ্ধ, এত বিখ্যাত সব শিল্পী আর শিল্পকর্ম রয়েছে যে সেসব এই স্বল্প পরিসরে লিখে শেষ করা যাবে না। তাই অল্প কিছু শিল্পী ও শিল্পকলার নাম উল্লেখ করা হলো। বড়ো হয়ে, উপরের ক্লাসে উঠে বা ভবিষ্যতে কোনো সময়ে নিজেদের আগ্রহে তোমরা চিত্রকলার এই বিশাল ভান্ডার সম্পর্কে বিভিন্ন বইয়ে জানতে পারবে। এই বইয়ের পরবর্তী অধ্যায়ে কয়েকজন বিখ্যাত শিল্পী সম্পর্কে সংক্ষেপে জানতে পারবে।

নমুনা প্রশ্ন

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১। সমগ্র শিল্পকলাকে প্রধানত–

ক. দুই ভাগে ভাগ করা হয়েছে খ. তিন ভাগে ভাগ করা হয়েছে

গ. চার ভাগে ভাগ করা হয়েছে ঘ. সাত ভাগে ভাগ করা হয়েছে

২। আদিম মানুষের তৈরি বেশিরভাগ ভাস্কর্যই ছিল–

ক. পশুমূর্তি খ. নরমূর্তি

গ. পাখির মূর্তি ঘ. নারীমূর্তি

৩। পিরামিড হচ্ছে বিশাল বিশাল পাথরের তৈরি–

ক. ত্রিভুজ আকৃতির মন্দির খ. ত্রিভুজ আকৃতির সমাধি

গ. চতুর্ভুজ আকৃতির ভবন ঘ. বিশাল পাথরের মূর্তি

৪। মাইকেল অ্যাঞ্জেলো ছিলেন মূলত খ্যাতিমান–

ক. ভাস্কর | খ. চিত্রশিল্পী

গ. স্থপতি | ঘ. সংগীতশিল্পী

৫। সংগীত, নাটক, চিত্রকলা ও ভাস্কর্য হচ্ছে–

ক. মানবিক কলার শাখা | খ. ললিতকলার শাখা

গ. কাব্যকলার শাখা | গ. পদ্য সাহিত্যের শাখা

৬। আদিম সমাজ ছিল–

ক. মাতৃতান্ত্রিক | খ. পিতৃতান্ত্রিক

গ. ভ্রাতৃতান্ত্রিক | ঘ. ভগ্নিতান্ত্রিক

লিখে জবাব দাও

১. শিল্পকলা বলতে কী বোঝ? পৃথিবীর সবচেয়ে প্রাচীন শিল্পকলা কী?

২. শিল্পকলার প্রধান দুইটি শাখা সম্পর্কে সংক্ষেপে লেখো।

৩. একটি ছক এঁকে শিল্পকলার বিভিন্ন শাখা দেখাও।

৪. শিল্পকলা চর্চার গুরুত্ব ব্যাখ্যা করো।

৫. প্রাচীন মিশরীয় চিত্রকলা সম্পর্কে তোমার ধারণা ব্যাখ্যা করো।

৬. সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রে চিত্রকলা ও কারুশিল্পের ভূমিকা বর্ণনা করো।

দ্বিতীয় অধ্যায়

দেশ-বিদেশের উল্লেখযোগ্য শিল্পী ও শিল্পকর্ম

শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিনের আঁকা 'মই দেয়া'

এ অধ্যায় পাঠ শেষে আমরা-

- বিশ্বের কয়েকজন উল্লেখযোগ্য শিল্পী ও তাঁদের শিল্পকর্ম সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারব।
- বাংলাদেশের খ্যাতিমান শিল্পীদের সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারব।
- বাংলাদেশের শিল্পকলায় মুক্তিযুদ্ধ এবং বাঙালি সংস্কৃতি প্রভাব সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারব।

বিশ্বের কয়েকজন উল্লেখযোগ্য শিল্পী ও শিল্পকর্ম

পাঠ : ১

টিসিয়ান

শিল্পী টিসিয়ান

(১৪৮৮–১৫৭৬)

ইতালির আল্পস অঞ্চলের প্রাকৃতিক সুন্দর ও মনোরম পরিবেশে টিসিয়ান জন্মগ্রহণ করেন। পিতা ছিলেন সামরিক বিভাগের উচ্চপদস্থ কর্মচারী। সে কারণে সামাজিক ও সংস্কৃতিমনা পরিবার হিসেবে তাঁদের একটা খ্যাতি ছিল। শৈশব থেকেই টিসিয়ান ছিলেন ভাবুক ও কবি প্রকৃতির। এর কারণ ছিল জন্মস্থানে প্রাকৃতিক পরিবেশ, পার্বত্য স্রোতধারা, সুশোভিত পত্রপুষ্প, পাইন বন, উন্মুক্ত আকাশ। এ সবকিছুই তাঁকে প্রভাবিত করেছে ছবি আঁকার অনুরাগী হতে, বাবা চেয়েছিলেন তাঁকে আইনজ্ঞ করতে। এজন্য তাঁকে ভেনিসে পাঠালেন। কিন্তু তিনি বন্ধু জর্জনের কাছে কুড়ি বছর বয়সে ছবি আঁকার প্রথম হাতেখড়ি নেন।

অল্পদিনের মধ্যেই টিসিয়ান নিজ প্রতিভা ও আভিজাত্যের জন্য অভিজাত সমাজে নিজেকে চিত্রশিল্পী হিসেবে তুলে ধরেন। প্রতিকৃতি ও কম্পোজিশন উভয় প্রকার চিত্রেই টিসিয়ানের দক্ষতা ছিল। ভেনিসিয়ান চিত্রশিল্পীদের মধ্যে টিসিয়ান ছিলেন সর্বপ্রধান এবং তিনি ইতালীয় অভিজাত সম্প্রদায়ের পৃষ্ঠপোষকতা পেয়েছেন। তাছাড়া ঐ সময় শিল্পকলার জন্য ইতালির ফ্লোরেন্সের যেমন খ্যাতি ছিল আন্তর্জাতিক বাণিজ্যকেন্দ্ররূপে ভেনিসেরও তেমনি যথেষ্ট খ্যাতি ছিল। ভেনিসে তিনি রাজকীয় শিল্পীপদপ্রাপ্ত হন। শিল্পীপ্রতিভা ছাড়াও মানুষ হিসেবেও টিসিয়ান ছিলেন অত্যন্ত ভদ্র। নিজের জ্ঞান ও চিত্রের মান সম্পর্কে তিনি ছিলেন অত্যন্ত সচেতন।

শিল্পী টিসিয়ানের আঁকা 'Mother'

রঙের উপর ছিল টিসিয়ানের অদ্ভুত দক্ষতা, মাত্র ছয় মাস বয়সে টিসিয়ান মাতৃহীন হন আর সে কারণেই জ্ঞান হওয়া পর্যন্ত তিনি তাঁর অন্তরের এই হাহাকার গোপন করতে পারেননি।

জীবনের শেষ সময়ে এসে 'Mother' নামে বিখ্যাত চিত্রখানি অঙ্কন করেন। তাঁর কল্পনা ছিল বিশুমাতা মেরীর মধ্যে নিজ মায়ের বিগত আত্মা প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা। মৃত্যুর কিছুকাল পূর্বে তিনি তাঁর মাকে স্বপ্ন দেখতেন– মা যেন তাঁকে ডাকছেন। তাই তো তিনি তাঁর বন্ধু ও ছাত্রদের বলতেন। মা আমাকে ডাকছেন, আমি শীঘ্রই তোমাদের ছেড়ে চলে যাব।

৯৯ বছর বয়সে প্লেগ রোগে আক্রান্ত হয়ে এই শিল্পী পরলোকগমন করেন। মৃত্যুর কয়েকদিন পূর্বে মাতৃমূর্তি ছবিটির অঙ্কন শেষ করেছিলেন। তাঁর বিখ্যাত ছবিগুলোর মধ্যে আরও আছে–

Dance and the Shower of gold. Bachus and Ariadne. Salome and head of John ইত্যাদি ছবিগুলো লন্ডনের ইম্পেরিয়েল আর্ট গ্যালারিতে সংগৃহীত আছে।

কাজ : টিশিয়ানের 'Mother' চিত্রটি সম্পর্কে লেখো।

পাঠ : ২

রেমব্রান্ট

(১৬০৬–১৬৬৯)

শিল্পী রেমব্রান্ট

রেমব্রান্ট জন্মগ্রহণ করেছিলেন হল্যান্ডের শিল্প, সাহিত্য, শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক কেন্দ্র লেডেনে (Leyden) ১৬০৬ সালের ১৫ই জুলাই। তাঁর পিতা ছিলেন বিত্তশালী লোক। তাঁর ইচ্ছা ছিল পুত্র উচ্চশিক্ষা নিয়ে লেডেনে একজন বিশিষ্ট নাগরিক হিসেবে প্রতিষ্ঠালাভ করবেন। কিন্তু রেমব্রান্টের এই গতানুগতিক সাধারণ শিক্ষা ভালো লাগত না। পড়ার বইয়ে তিনি জীবজন্তুর ছবি এঁকে রাখতেন। পিতা তাঁর মনোভাব বুঝতে পেরে ১৩ বছর বয়সে জ্যাকোব ভ্যান (Jacob Van) নামের একজন স্থানীয় শিল্পীর নিকট প্রেরণ করেন। পরবর্তীকালে প্রতিকৃতি চিত্রকর Dieter Lastman-এর নিকট কৃতিত্বের সঙ্গে শিক্ষা সমাপ্ত করে ১৬২৪ সালে রেমব্রান্ট লেডেনে ফিরে এসে একটি শিল্পীচক্র গঠন করে স্বাধীনভাবে ব্যবসা আরম্ভ করেন।

শিল্পী রেমব্রান্টের আঁকা 'ফ্লোরা'

পঁচিশ বছর বয়সে রেমব্রান্ট অতি অল্প দিনের মধ্যে সাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। সুদক্ষ প্রকৃতি চিত্রকর হিসেবে তাঁর সুখ্যাতি চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ে। অতি দ্রুত ব্যবসা জমে ওঠে, বহু চিত্রের ফরমায়েশ পেতে থাকেন এবং সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানও শিল্পীকে ফরমায়েশ দিতে থাকে। শুধু সুদক্ষ এচার (etcher)রূপেও তাঁর কৃতিত্ব প্রচারিত হয়, পেইন্টিং নয়, এচিং কাজেও রেমব্রান্টের অদ্ভুত দক্ষতা ছিল।

রেমব্রান্ট একসময় মোগল চিত্রের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে ঐ পদ্ধতির অনেকগুলো চিত্র নকল করেছিলেন, কিন্তু ওগুলো মোগল চিত্রের ন্যায় উন্নত হয়নি।

তথাপি লন্ডনের সদরে সোথবি কোম্পানি রেমব্রান্টের আঁকা শাহজাহানের একখানি চিত্র শুধু তাঁর গৌরবোজ্জ্বল কৃতিত্বের জন্য ১,৭৫,০০০ টাকায় ক্রয় করেন। ভারতের মূল মোগল চিত্র এর শতাংশ মূল্যেও বিক্রয় হয়নি।

চিত্র অঙ্কনের ক্ষেত্রে রেমব্রান্ট ছিলেন নির্ভীক ও আত্মসচেতন। চিত্রের বিষয়বস্তুর সাথে আলোর নাটকীয়তাই তাঁর চিত্রকে বৈশিষ্ট্য দান করেছে। বিন্যাসের দিক থেকে তিনি ছিলেন যুগশিল্পী। সমগ্র ছবির মধ্যে গভীর টোন ও সংশ্লিষ্ট কম্পোজিশনের বর্ণ সঙ্গতি ভারসাম্য রক্ষায় শিল্পীর অদ্ভুত কলাজ্ঞানের পরিচয় পাওয়া যায়।

রেমব্রান্ট ৩৮ বছরের কর্মজীবনে এচিং, ড্রইং ও পেইন্টিং মিলিয়ে কয়েক হাজার চিত্র অঙ্কন করেছেন।

তাঁর বিখ্যাত শিল্পকর্মের মধ্যে রয়েছে–The blindness of Tobit. ধর্মবিষয়ক চিত্রের মধ্যে The Raising of Lazarus Christ at Emmans (লুভর মিউজিয়ামে সংরক্ষিত). সামাজিক উৎসবচিত্রের মধ্যে Samsons;Wedding Feast কম্পোজিশন ধরনের প্রতিকৃতির মধ্যে An old man in Thought ও Flora উল্লেখযোগ্য চিত্র।

১৬৬৯ সালে এই মহান শিল্পী পরলোকগমন করেন।

কাজ : রেমব্রান্ট সম্পর্কে কয়েকটি বাক্য লেখো।

পাঠ : ৩

মাতিস

(১৮৬৯–১৯৫৪)

শিল্পী হেনরি মাতিস

১৮৬৯ সালে উত্তর ফ্রান্সে মাতিস জন্মগ্রহণ করেন। প্রথম জীবনে মাতিস আধুনিক ও প্রাচীন বহু শিল্পীরীতি অনুশীলন করেছেন। ড্রইং বা রেখার প্রতি ছিল তাঁর অদ্ভুত দক্ষতা। প্রত্যেক রীতির মধ্যেই তিনি নিজস্ব স্বাধীন স্বতন্ত্র রীতির সন্ধান করেছেন। পারস্য পুথিচিত্রের অনুশীলন কিছুদিন শিশুচিত্রের ন্যায় চিত্ররীতিতে অঙ্কন করতে গিয়ে বুঝতে পারেন ঐ পদ্ধতি তাঁর উপযোগী নয়, কারণ তাঁর সুদক্ষ রেখাবিন্যাস ক্ষমতা পান্ডিত্য প্রভৃতি অন্তরায় হয়েছিল। বাধ্য হয়ে তিনি এমন একটি পদ্ধতি গ্রহণ করেন যাতে চিন্তা, নিষ্ঠা, নিখুঁত ক্রাফটসম্যানশিপ ও শিশুচিত্রের ন্যায় সরলতাপূর্ণ ছিল। তাঁর চিত্রে বর্ণ ও রেখার ছন্দ প্রয়োগে সনাতনী শিল্পের তাল, মান, লয় ঠিক না থাকলেও দর্শককে আকৃষ্ট করে। কারণ মূল বক্তব্যের সঙ্গে পারিপার্শ্বিকতার সঙ্গতি রক্ষা করে অলংকারযুক্ত রেখার বিন্যাসে মাতিস ছন্দগত কৃতিত্ব প্রদর্শন করেছেন। আলোছায়ার প্রয়োগ সংযত করায় চিত্রগুলো দ্বিমাত্রিক আকৃতি ধারণ করেছে।

বিষয় নির্বাচনে তিনি ছিলেন সার্বজনীন। একটা সামান্য বিষয়কেও শিল্পী তাঁর দক্ষতায় তাকে শ্রেষ্ঠত্ব দান করতে পারেন। শিল্পীর অঙ্কনকৌশল চিত্রের বিষয়ের উপর নির্ভর করে না। এটা তাঁর নিজস্ব অভিজ্ঞতার উপর নির্ভরশীল। বিষয়ের বাহ্যিকরূপ শিল্পীর নিকট সত্য হতে পারে না। শিল্পীর অন্তরে প্রতিফলিত প্রকৃতি বা বিষয়ের রূপই চিত্রের প্রকৃত রূপ।

মাতিসের চিত্রে পরিপ্রেক্ষিত উপেক্ষিত হয়েছে– প্রতিকৃতিচিত্রে লাল, নীল প্রভৃতি বর্ণ তিনি নিজ খেয়ালখুশিতে প্রয়োগ করেছেন। বর্ণ ভারী ও উজ্জ্বল। 'The Dance' নামক চিত্রখানি মাতিসের একখানি বিখ্যাত চিত্র। এটা এখন মস্কোতে আছে। চিত্রখানি বলিষ্ঠ রেখা ও Wash-এ অঙ্কিত হয়েছে। চিত্রের একদল নারী-পুরুষ ছান্দিক গতিতে চক্রাকারে নৃত্যরত।

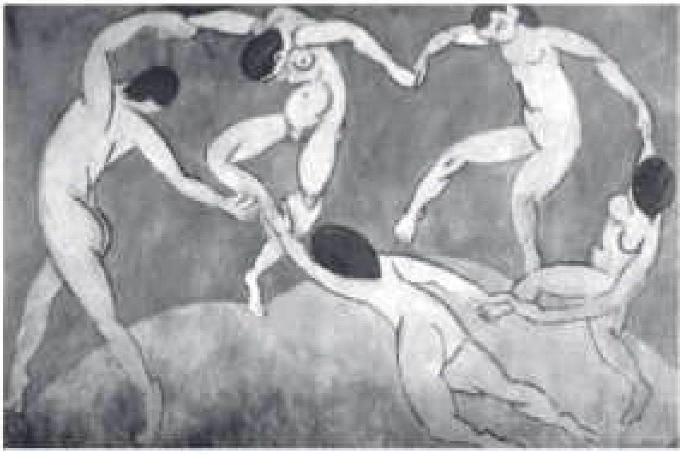

শিল্পী হেনরি মাতিস-এর আঁকা 'The Dance'

মানুষগুলো এখানে রূপক, তাদের দৈহিক রূপ প্রকাশ করা শিল্পীর উদ্দেশ্য নয়, তিনি নৃত্যের অন্তর্নিহিত ছান্দিক রূপ ও গতি প্রকাশ করার জন্য চিত্রখানি অঙ্কন করেছেন। খুব স্বল্প বর্ণ, স্বল্প রেখা, স্বল্প কলাকৌশল ও পরিশ্রমের দ্বারা বিষয়ের ভাব প্রকাশ করার যে মতবাদ, তার সার্থক রূপ মাতিসের বিখ্যাত 'Head of a Woman' চিত্রে। ১৯৫৪ খ্রিস্টাব্দে তিনি পরলোকগমন করেন।

কাজ : মাতিসের চিত্রকর্মের বৈশিষ্ট্য লেখো।

পাঠ : ৪

পল সেজান

(১৮৩৯–১৯০৬)

আধুনিক চিত্রকলার জনক পল সেজান ১৮৩৯ খ্রিস্টাব্দে রোন নদীর তীরবর্তী এক প্রদেশে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা ছিলেন একজন ব্যাংকার। আর্থিক অবস্থা ছিল সচ্ছল। প্রথমে যখন তিনি প্যারিসে গেলেন, অত্যন্ত লাজুক থাকার কারণে লোকের সাথে মিশতে পারতেন না। তাতে পারিপার্শ্বিক লোকেরা মনে করতেন সেজান অত্যন্ত দাম্ভিক। পিতার আর্থিক সহযোগিতায় প্রায় দশ বছর পর্যন্ত তিনি চিত্রকলা অধ্যয়ন করেন। কিন্তু ছবি আঁকার তৃপ্তি তাঁর মিটল না। সেজানের ব্যক্তিগত জীবন ছিল অত্যন্ত সহজ ও সাদামাটা এবং নানা ঘাতপ্রতিঘাতপূর্ণ। সকলসময় কঠোর পরিশ্রম করতেন। ছবি আঁকা নিয়ে অনেক পরীক্ষা-নিরীক্ষা করলেও তিনি তাঁর সৃষ্টিকর্মের জন্য কখনোই সম্মান বা স্বীকৃতি পাননি। প্যারিসের শিক্ষা ও অধ্যয়ন সমাপ্ত করে তিনি আবার নিজ জন্মস্থানে ফিরে আসেন। ব্যাংকার বাবার দেয়া মাসিক ১২ পাউন্ড ভাতা দিয়ে চলতেন। তিনি ছবি

শিল্পী পল সেজান

শিল্পী পল সেজানের আঁকা স্টিল লাইফ

বিক্রয় করা পছন্দ করতেন না। অন্তরের গভীর উপলব্ধি থেকে প্রকৃতি ও জীবনকে রঙের মায়াজালে বন্দি করার জন্যই তিনি ছবি আঁকতেন।

কখনো কখনো বাইরের চিত্র অঙ্কন করে তা যখন সমাপ্ত হতো ওগুলো ঘরের নিকটবর্তী ঝোপের মাঝে ফেলে দিয়ে খালি হাতে বাড়ি ফিরে আসতেন। আর এ কারণে গোপনে তাঁর স্ত্রী তাঁকে অনুসরণ করতেন এবং ছবিগুলো সংগ্রহ করে গৃহের এক কোণায় লুকিয়ে রাখতেন। বলা যায় তিনি জীবিকার জন্য ছবি আঁকেননি, বরং ছবি আঁকার জন্যই তিনি বেঁচে ছিলেন। তিনি ছবি আঁকার একটি ধারা তৈরি করেছিলেন যার নাম ছিল Post Impressionism.তাঁর উল্লেখযোগ্য ছবির মধ্যে রয়েছে–'তাস খেলা'। ১৯০৬ সালে তিনি পরলোকগমন করেন।

কাজ : Post Impressionism -এর ধারা কে তৈরি করেন? তাঁর সম্পর্কে কয়েকটি বাক্য লেখো।

পাঠ : ৫

অগুস্ত রদ্যাঁ

(১৮৪০-১৯১৭)

ফ্রঁসোয়া অগুস্ত রেনে রদ্যাঁ ফ্রান্সের প্যারীতে ১৮৪০ সালে জন্মগ্রহণ করেন। ছেলেবেলায় তিনি সুস্বাস্থ্যের অধিকারী ছিলেন না। মাথাভর্তি লাল চুল, লাজুক মুখচোরা বালক রদ্যাঁ অন্যান্য সমবয়সি হইচই করা ছেলেমেয়েদের সাথে মিশতে পারতেন না। কিন্তু একা একা ছবি আঁকার ক্ষেত্রে তাঁর ছিল পাগলের মতো নেশা। শৈশব থেকেই শিল্পকলার প্রতি ছিল তাঁর বিশেষ দুর্বলতা। বাল্যকালে পাঠ্যবইয়ের ইলাস্ট্রেশন ও ছবি দেখে সে রকম আঁকার চেষ্টা করেও কোনো শিল্প শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ভর্তি হতে পারেননি। ছবি আঁকার রং, তুলি, ক্যানভাস এগুলোর ব্যয়ভার জোগাতে পারবেন না, সেজন্য সিদ্ধান্ত নেন ভাস্কর হওয়ার, অন্তত মাটিটা বিনামূল্যে জোগাতে পারবেন ভেবে।

ভাস্কর অগুস্ত রদ্যাঁ

তিনি একটি প্রাইভেট বোর্ডিং স্কুলে বছর দুই পড়াশোনা করেন। কিন্তু ল্যাটিন ও অন্যান্য গতানুগতিক বিষয়ে পড়তে তাঁর

মোটেই ভালো লাগল না। অবশেষে ছবি আঁকার প্রতি ছেলের দুর্নিবার আকর্ষণ দেখে বাবা তাঁকে একটি চিত্রকলার স্কুলে ভর্তি করে দিলেন। শিক্ষক ছিলেন হোরেস লিকক দ্য বয়বদ্রঁ। অত্যন্ত দক্ষ শিক্ষক লিকক ১৮৪৭ সালে প্রকাশিত তাঁর একটি গ্রন্থে নিজের শিক্ষাদান পদ্ধতি সম্পর্কে লিখেছেন যে, তিনি সর্বাগ্রে চেষ্টা করতেন শিক্ষার্থীর ব্যক্তিত্ব যেন বিকশিত হয়। সে যেন নিজের চোখ দিয়ে জীবনকে দেখতে শেখে এবং তারপর সেই দেখার স্মৃতিকে অবলম্বন করে আঁকার কাজে ব্রতী হয়। ভাস্কর্য তৈরি শেখার মধ্যে ডুবে যাবার পর রদাঁ্য শুধু এই স্কুলের ক্লাসের মধ্যেই নিজেকে আবদ্ধ রাখেননি। তিনি লুভ্যরে গিয়ে প্রাচীন মার্বেলের ভাস্কর্যগুলো আবিষ্কার করলেন। ইম্পেরিয়াল গ্রন্থাগারে গিয়ে খোদাই কাজগুলোর ছবি আঁকলেন। ঘোড়ার হাটে গিয়ে জীবন্ত মডেল থেকে স্কেচ করলেন। এ সময় রদাঁ্য ম্যানুফ্যাকচার দ্য গবলিতে যোগ দেন। প্রথম থেকেই রদাঁ্যকে তাঁর নিজের সমস্যার সমাধান নিজেকেই করতে হয়েছে। অসম্ভব মনোবল, অধ্যবসায় ও আত্মবিশ্বাস নিয়ে কাজ করেছেন। এ সময় সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত সারা শহর ঘুরে ঘুরে বিভিন্ন মূর্তি ও মানুষের ড্রইং করতেন।

রদাঁ্যর তৈরি ভাস্কর্য 'দ্য থিংকার'

রদাঁ্যর যৌবন কেটেছে কাজ নিয়ে উন্মত্ততায় এবং লোকসমাজের অজ্ঞাতে। এ সময় কবি বোদলেয়ার ও দান্তের কবিতা ছিল তাঁর নিত্যসঙ্গী। রদাঁ্য আজীবনই ছিলেন কাজপাগল মানুষ। তাঁর ভাস্কর্যে গতি ও প্রাণময়তা ভাস্কর্যকে নিয়ে এসেছিল জীবনের কাছাকাছি। তাঁকে অনেকে সে সময়কার ইম্প্রেশনিস্টদের সাথে তুলনা করলেও তিনি ছিলেন কিছুটা সিম্বলিস্ট বা প্রতীকী ধারার শিল্পী। বক্তব্য ও গতিময়তা তাঁর কাজের বৈশিষ্ট্য হলেও ভাস্কর্যের অন্য সব নিয়ম-ব্যাকরণকেও ব্যবহার করেছেন অত্যন্ত দক্ষভাবে। ভাস্কর্যগুলো ছিল প্রাণময় ও আবেগপূর্ণ। তাঁর নিজের উক্তিতে বলেছেন–

'শিল্পের প্রকৃত সৌন্দর্য সত্যের উন্মোচনে যদি কেউ তার দেখার জিনিসকে নির্বোধের মতো শুধুই দৃষ্টিনন্দন করতে চায়, কিংবা বাস্তবের দেখা কদর্যতাকে আড়াল করতে চায়, কিংবা তার অন্তর্গত বিষাদকে লুকিয়ে রাখতে চায়, তাহলে তাই হবে প্রকৃত কদর্যতা, আর সেখানে কোনো খাঁটি অভিব্যক্তিও থাকবে না। তিনি আরও বলেছেন–শ্রেষ্ঠ শিল্প মানব এবং জগৎ সম্বন্ধে যা কিছু জানবার সবই জানিয়ে দেয়। কিন্তু তারপরও যা জানায় তা হলো সেখানে এমন কিছু আছে যা চিরকাল অজানাই থেকে যাবে। প্রত্যেক মহৎ শিল্পকর্মের মধ্যেই থাকে রহস্যের এই গুণাবলি।'

রদাঁ্য সর্বদা তাঁর উপকরণকে খোলামনে গ্রহণ করেছেন, কখনো তাকে লুকোতে বা তার কাছ থেকে পালিয়ে যেতে চাননি। তাঁর ফিগারগুলো দেখলে মনে হয় সেগুলো যেন তাদের আদি পাথর কিংবা মাটির অবস্থা থেকে সরাসরি উঠে এসেছে। মাইকেল অ্যাঞ্জেলো তাঁর কোনো কোনো ফিগার কিছুটা অসম্পূর্ণ রেখেছেন পরিবেশ ও পরিস্থিতির প্রতিকূলতার কারণে, বস্তুগত সীমাবদ্ধতার জন্য। কিন্তু রদাঁ্যর কোনো কোনো ফিগার যাকে অসম্পূর্ণতার চিহ্ন বলে মনে হয় তা শিল্পীর সচেতন সৃষ্টি, তার মধ্যে ফুটে উঠেছে শিল্পীর নিজস্ব ডিজাইনের বিশেষ অভিব্যক্তি। রদাঁ্য কখনোই নিছক বর্ণনায় তুষ্ট হননি। সর্বদা তিনি আরো এক পা এগিয়ে গেছেন। তাঁর কাজ বহুমাত্রিক। আমরা সেখানে পাই বাস্তবতা, রোমান্টিকতা, অভিব্যক্তিবাদ, ইম্প্রেশনিজম এবং যৌনতার অনুষঙ্গমাখা মরমিবাদ।

তাঁর উল্লেখযোগ্য ভাস্কর্যগুলোর মধ্যে দ্য থিংকার, চুম্বন, বালজাক, দ্য সাইরেন্স, দ্য সিক্রেট, অনন্ত বসন্ত, ইভ, তিন ছায়ামূর্তি প্রভৃতি।

রদাঁ আজীবন চিন্তা করে গেছেন ভাস্কর্য নিয়ে এবং বিশ্বাস করেছেন চিন্তাই মানুষের অন্যতম সংগ্রাম। অসুস্থ রদাঁ পরলোকগমন করেন ১৭ই নভেম্বর। তাঁর মরদেহ সমাধিস্থ হয় ম্যদঁতে ২৪শে নভেম্বর। তাঁর শেষ ইচ্ছা অনুযায়ী দ্য থিংকার ভাস্কর্যটি স্থাপন করা হয়েছে তাঁর সমাধি শিয়রে।

পাঠ : ৬

রামকিঙ্কর বেইজ

(২৬শে মে ১৯০৬–২রা আগস্ট ১৯৮০)

শিল্পী রামকিঙ্কর বেইজ

১৯০৬ সালে ২৬শে মে বাবা চণ্ডিচরণ ও মা সম্পূর্ণা দেবীর কোলে পশ্চিমবঙ্গের বাঁকুড়া জেলার যোগীপাড়ার এক আদিবাসী গৃহে জন্মগ্রহণ করেন। খুব অভাবী পরিবার, ক্ষৌরকর্মই জীবিকা, শৈশবে কুমোরদের ছবি আঁকা দেখে আপনমনে ছবি আঁকতেন ওদের মতো রং-তুলি দিয়ে। মামার বাড়ি বিষ্ণুপুরের কালাকুশি যাওয়ার পথে সূত্রধরদের বসবাস। সে সময়ই অনন্ত সূত্রধর নামের এক মিস্ত্রির কাছে রামকিঙ্করের মূর্তি গড়ার প্রথম পাঠ। এছাড়া বিষ্ণুপুরের মন্দিরের কাজও তাঁকে টেনেছে। মন্দিরের পোড়ামাটি আর পাথরের কাজের নকল করেই শিল্পীর পথ চলা শুরু। বাঁকুড়ার বিখ্যাত শিল্পী রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের দৃষ্টিতে এই তরুণের ভবিষ্যৎ সম্ভাবনাপূর্ণ, কলাকর্ম আকৃষ্ট হওয়ার মতো। তিনি রামকিঙ্করকে স্কুল থেকে ছাড়িয়ে এনে শান্তি নিকেতনের কলাভবনে নন্দলাল বসুর কাছে অর্পণ করেন। লেখাপড়া যতটুকু করেছেন তাতে সাধারণ প্রাতিষ্ঠানিক লেখাপড়ার প্রতি তাঁর আগ্রহ ছিল না। ছবি আঁকা আর মূর্তি গড়াতেই ছিল তাঁর আসল মনোযোগ। তিনি নিজের বৈশিষ্ট্যের মধ্যে বড়ো হবেন এই ছিল তাঁর আদর্শ ও চিন্তা, সে কারণেই রামকিঙ্কর ছিলেন ভারতীয় সাঁওতাল ভাস্কর। তিনি আধুনিক ভারতীয় ভাস্কর্যকলার অন্যতম অগ্রপথিক। যিনি আধুনিক পাশ্চাত্য শিল্প অধ্যয়ন করে সেই শৈলী নিজের ভাস্কর্যে প্রয়োগ করেন। তাঁকে ভারতীয় শিল্পে আধুনিকতার জনক ও অন্যতম শ্রেষ্ঠ শিল্পী মনে করা হয়। রামকিঙ্করের কাজের একটি অন্যতম বৈশিষ্ট্য গতিশীলতা। তাঁর ছবি এবং ভাস্কর্যের প্রায় সকল আকৃতিই গতিশীল। কেউই থেমে নেই। তাঁর বড়ো ভাস্কর্যের বেশিরভাগই উন্মুক্ত জায়গায় করা।

রামকিঙ্করের পেশাগত জীবনের ভবিষ্যৎ নির্ধারিত হয় ১৯৩৪ সালে। তিনি যখন কলাভবনের স্থায়ী শিক্ষক হিসেবে নিয়োজিত হন। ১৯৩৫ এবং ১৯৩৬ সালে অনেকগুলো কাজ তিনি শেষ করেন। এই সময়ের গুরুত্বপূর্ণ কাজগুলোর মধ্যে রয়েছে রিলিফ, সাঁওতাল দম্পতি, কৃষ্ণগোপিনী, সুজাতা প্রভৃতি। ১৯৩৭ থেকে তিনি ছাত্রদের মডেলিং শেখানোর দায়িত্ব নেন। ঐ বছরের মাঝামাঝি সময়টাকে রামকিঙ্করের তেলরং পর্বের শুরু ধরা হয়। ১৯৩৭ থেকে ১৯৪২ সালের মধ্যে তিনি অনেকগুলো গুরুত্বপূর্ণ তেলরং চিত্রের কাজ শেষ করেন। মহাত্মা গান্ধী, বুদ্ধ ও সুজাতা, হাটে সাঁওতাল দম্পতি,

কাজের শেষে সাঁওতাল রমণী, শিলং সিরিজ, শরৎকাল, ফুলের জন্ম, নতুন শস্য, বিনোদিনী, মহিলা ও কুকুর, গ্রীষ্মকাল তাঁর উল্লেখযোগ্য চিত্র। একই সময়ের মধ্যে শেষ হয় তাঁর অনেকগুলো বিখ্যাত ভাস্কর্যের কাজও, তাঁর সৃষ্টিকর্মের কাল বিচারে এটিই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সময় বলা যেতে পারে। এই পর্বে করা তাঁর বিখ্যাত ভাস্কর্যগুলোর মধ্যে কংক্রিটে তৈরি সাঁওতাল পরিবার, প্লাস্টারে করা রবীন্দ্রনাথের প্রতিকৃতি, সিমেন্ট দিয়ে হেড অব এ ওম্যান, বাতিদান অন্যতম।

শিল্পী রামকিঙ্কর বেইজের তৈরি 'সুজাতা'

ইউক্যালিপটাস গাছের ছায়ায় যে 'সুজাতা' মূর্তিটি স্থাপিত আছে ঐটিকে শিল্পী তাঁর একটি প্রিয় কাজ বলতেন। তিনি বলতেন– ওটি নড়ে, কথা বলে। প্রতিদিন যাদের নানাভাবে ও নানা কাজে দেখেছেন রামকিঙ্কর তাদের কথাই জীবন ভর ভেবেছেন, তাদের তিনি ভালোবেসে তাঁর সৃষ্টির মধ্যে এনে সকলের সম্মুখ চিত্রে ও ভাস্কর্যের মধ্যে তুলে ধরেছেন।

অভিনয় ও সংগীতের প্রতিও তাঁর প্রচণ্ড আকর্ষণ ছিল। শান্তিনিকেতনে অনেক নাটক রামকিঙ্করের নির্দেশনায় অভিনীত হয়েছে। রামকিঙ্কর চিরকুমার ছিলেন। ঘর বাঁধা হয়নি এই আত্মভোলা শিল্পীর। অনলসভাবে তিনি প্রায় ৭০ বছর বয়স পর্যন্ত কলালক্ষ্মীর উপাসনা করে ১৯৮০ সালের ২রা আগস্ট পরলোকগমন করেন।

পাঠ: ৭

বাংলাদেশের খ্যাতনামা শিল্পীদের পরিচিতি

বাংলাদেশে আধুনিক শিল্পকলার যাত্রা শুরু ১৯৪৮ সালে। তখন দেশের নাম পাকিস্তান।আমাদের এই অঞ্চলের নাম পূর্ব পাকিস্তান। বর্তমানে যেটা বাংলাদেশ। ভারত ভাগ হয়ে দুই দেশ হওয়ার ফলে পাকিস্তানের পূর্ব অংশ পূর্ব-পাকিস্তানের রাজধানী ঢাকা শহরে অনেক মুসলমান নাগরিক চলে আসেন ভারতের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে। তারা নতুন স্বাধীন দেশে নতুন করে গড়ে তোলেন নতুন প্রশাসন, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, শিল্প কারখানা ও নতুন জনপদ। কলকাতা থেকে ঢাকায় চলে আসেন কয়েকজন বিশিষ্ট চিত্রশিল্পী। এঁরা হলেন শিল্পী জয়নুল আবেদিন (পরে শিল্পাচার্য উপাধি পেয়েছেন), কামরুল হাসান, আনোয়ারুল হক, শফিউদ্দিন আহমেদ, শফিকুল আমিন, খাজা শফিক আহমদ প্রমুখ। এঁরাই উদ্যোগ গ্রহণ করে ও অনেক চেষ্টা করে শিল্পকলা শিক্ষার একটি প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলেন। ১৯৪৮ সালে ঢাকা শহরে প্রতিষ্ঠিত এই প্রতিষ্ঠানের নাম ছিল গভর্নমেন্ট ইনস্টিটিউট অব আর্ট। মাত্র বারোজন ছাত্র নিয়ে প্রথম ছবি আঁকার ক্লাস শুরু হয়। পাঁচ বছরের শিক্ষা কোর্স। প্রথম দলটি পাস করে বের হন ১৯৫৩ সালে। তারপর প্রতি বছর কয়েকজন করে শিল্পকলায় শিক্ষা লাভ করে পাস করতে থাকেন। এই নবীন শিল্পীদের অনেকেই তখন দেশের বাইরে ইউরোপ, আমেরিকা ও এশিয়ার উন্নত দেশগুলোতে চলে যান, শিল্পকলায় উন্নততর শিক্ষাগ্রহণ করতে। কয়েক বছর পর এরা দেশে ফিরে এসে তাঁদের অভিজ্ঞতা, নতুন ধ্যানধারণায় আঁকা ছবি ও ভাস্কর্য প্রদর্শনী করে দেশের শিল্পকলার প্রসার ঘটাতে থাকেন। অনেকেই

২০২৫

যোগ দেন এই আর্ট ইনস্টিটিউটে। পুরোনো প্রতিষ্ঠিত শিক্ষকরা নবীন শিক্ষকদের পেয়ে শিল্পকলা শিক্ষাকে আরও উন্নত করতে থাকেন। ধীরে ধীরে শিল্পীরা জনসাধারণকে চিত্রশিল্প ও অন্যান্য শিল্পকলার প্রয়োজন বোঝাতে সমর্থ হন। রুচি পাল্টাতে থাকে সমাজের বিভিন্ন স্তরের। শিল্পীরা জীবনযাপনের অনেক কাজকে সুন্দর রূপ ও সুষমা দিয়ে গড়ে তুলতে থাকেন। ফলে ধীরে ধীরে শিল্পীদের জন্য বিভিন্ন সংস্থায় চাকরির পদ হয়, কাজের পরিধি বাড়তে থাকে। আজ সমাজে একজন ডাক্তার, একজন ইঞ্জিনিয়ার, একজন বিজ্ঞানী যেমন অবশ্য প্রয়োজনীয়, একজন শিল্পীর প্রয়োজনও তেমনি সমান গুরুত্বপূর্ণ। চিত্রশিল্পীরা সমাজজীবনের অনেক গুরুত্বপূর্ণ কাজে নিয়োজিত। শিল্প, সংস্কৃতি, শিক্ষা, ব্যবসা ও প্রশাসন–সর্বক্ষেত্রেই আজ শিল্পীদের প্রয়োজন। টেলিভিশনের অনুষ্ঠান, সিনেমা তৈরিতে, খবরের কাগজে ছবি, কার্টুন ও

চারুকলা অনুষদ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

সুন্দর প্রকাশনায়, বই-পুস্তকের জন্য ছবি, প্রচারের জন্য পোস্টার তৈরিতে, বিজ্ঞাপনে, শিল্পকারখানার দ্রব্যাদির আকার-আকৃতির নকশায়, শিল্পদ্রব্যের প্যাকেটের নকশায়, পোশাকশিল্পের নকশায়, কাপড় তৈরির শিল্পে, আসবাবপত্রের নকশায় এমনি অনেক প্রয়োজনীয় কাজে শিল্পীরা তাঁদের সৌন্দর্যবোধকে কাজে লাগাচ্ছেন।

১৯৪৮ সালে যাত্রা শুরু করে সেদিনের গভর্নমেন্ট আর্ট ইনস্টিটিউট আজ এক বিরাট প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছে। বর্তমানে প্রতিষ্ঠানটি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা অনুষদ হিসেবে শিল্পকলার বিভিন্ন বিভাগে শিক্ষাদান করছে। ১৯৭১ পর্যন্ত একটিমাত্র শিল্প শিক্ষার প্রতিষ্ঠান ছিল। বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জনের পর শিল্পকলার ক্ষেত্র প্রসার লাভ করায় শিল্পীদের প্রয়োজন আরও বেড়ে যায়। ফলে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে চারুকলা বিভাগের প্রতিষ্ঠা হয়। চট্টগ্রামে একটি পূর্ণাঙ্গ সরকারি চারুকলা কলেজও প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। বর্তমানে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা বিভাগ এবং সরকারি আর্ট কলেজ একত্রিত হয়ে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে একটি পূর্ণাঙ্গ ইনস্টিটিউট হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের সাথে সংযুক্ত রাজশাহী চারু ও কারুকলা মহাবিদ্যালয়টি বর্তমানে ঐ বিশ্ববিদ্যালয়ের কলা অনুষদে চারুকলা বিভাগ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এবং খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে রয়েছে একটি চারুকলা অনুষদ। ময়মনসিংহের ত্রিশালে অবস্থিত জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম বিশ্ববিদ্যালয়ের কলা অনুষদে রয়েছে চারুকলা বিভাগ। সম্প্রতি জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় ও জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে চারুকলা বিভাগ। এছাড়া ইউনিভার্সিটি অব ডেভেলপমেন্ট অলটারনেটিভ (ইউডা)সহ কয়েকটি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়েও দেওয়া হচ্ছে চারুকলা শিক্ষা। তদুপরি ঢাকা, রাজশাহী, বগুড়া, যশোর, নড়াইল, নারায়ণগঞ্জসহ দেশের বিভিন্ন শহরে রয়েছে বেশ কয়েকটি বেসরকারি আর্ট কলেজ। এছাড়াও শিশুদের ছবি আঁকার জন্য শিশু একাডেমিসহ বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান রয়েছে।

বাংলাদেশে এখন অনেক চিত্রশিল্পী ও ভাস্কর রয়েছেন। দেশে-বিদেশে শিল্পী ও শিক্ষার্থীদের শিল্পকর্মের প্রদর্শনী হচ্ছে। বিশ্বের অনেক উন্নত দেশে গিয়ে বাংলাদেশের শিল্পীরা তাঁদের শিল্পকর্মের জন্য সুনাম ও দেশের জন্য গৌরব অর্জন করছেন। তাঁদের মূল্যবান শিল্পকর্ম বিখ্যাত জাদুঘর ও সংগ্রহশালায় সংগ্রহ করা হয়েছে।

বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি জাতীয় ভিত্তিতে বাংলাদেশের শিল্পীদের আঁকা চিত্র প্রদর্শনীর আয়োজন করেন। প্রতি দুই বছর পরপর আয়োজন করা হয় আন্তর্জাতিক শিল্পকলা প্রদর্শনী ও সম্মেলন। প্রদর্শনীর নাম-এশিয়ান বিয়েনাল বা এশিয়ান দ্বিবার্ষিক প্রদর্শনী। অনেক দেশের শিল্পীরা এতে অংশগ্রহণ করেন। এই সকল এশিয়ান বিয়েনাল-এর জন্য বিশ্বের অনেক উন্নত দেশে বাংলাদেশের সুনাম ছড়িয়ে পড়েছে।

বাংলাদেশে বর্তমানে অনেক চিত্রশিল্পী ও ভাস্কর আছেন। তাঁদের সবার কথা এখানে বলা সম্ভব নয়। কয়েকজন উল্লেখযোগ্য শিল্পীর কথা সংক্ষেপে এখানে আলোচনা করা হলো। অন্যান্যদের কথা ধীরে ধীরে জানতে পারবে।

পাঠ : ৮

শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিন

অনেক সুন্দর ও উল্লেখযোগ্য ছবি এঁকেছেন জয়নুল আবেদিন। এগুলো এখন বাংলাদেশের মূল্যবান সম্পদ এবং দেশে বিদেশে বিখ্যাত শিল্পকর্ম। এদেশে শিল্পকলা চর্চার জন্য প্রথম যে প্রতিষ্ঠান আর্ট ইনস্টিটিউট-তার প্রধান প্রতিষ্ঠাতা এবং প্রথম অধ্যক্ষ ছিলেন শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিন। তিনি বাংলাদেশের নামকরা অনেক শিল্পীকে হাতে ধরে ছবি আঁকা শিখিয়েছেন। শিল্পীদের জন্য কর্মক্ষেত্র তৈরি করেছেন। সমাজকে সুন্দরভাবে চালিত করতে শিল্পীদের প্রয়োজন তা এদেশের মানুষকে বোঝাতে পেরেছেন। শিশু-কিশোরদের জন্য ছবি আঁকার স্কুল ও প্রতিষ্ঠান গড়েছেন। শিল্পকলার ক্ষেত্রে অবদানের জন্য বাংলাদেশের মানুষ তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে তাঁকে ভালোবেসে নাম দিয়েছে শিল্পাচার্য।

শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিন

শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিনের জন্ম ২৯শে ডিসেম্বর ১৯১৪ সালে ময়মনসিংহে। স্কুলের লেখাপড়া শেষ করে ভর্তি হন কলকাতা আর্ট স্কুলে। ভালো ছাত্র হিসেবে অল্পদিনেই সুনাম অর্জন করেন। আর্ট স্কুলের শিক্ষা শেষে সেখানেই শিক্ষকতার নিয়োগ পান। ১৯৩৮ সালে খুব ভালো ফল করে তিনি উত্তীর্ণ হন।

তরুণ বয়সেই ছবি আঁকায় প্রচুর খ্যাতি অর্জন করেন জয়নুল। ১৩৫০ সালে বাংলায় প্রচণ্ড দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়। তৎকালীন ব্রিটিশ শাসকদের অবহেলা ও অমানবিকতার কারণেই সাধারণ মানুষের খাবারের অভাব হয়েছিল। কলকাতার রাস্তায় হাজার হাজার মানুষের মৃত্যু ও অসহায় অবস্থা তরুণ শিল্পী জয়নুলের মনকে পীড়া দিয়েছিল। ব্রিটিশ শাসকদের প্রতি তীব্র ঘৃণা জন্মাল – মনে মনে ক্ষুব্ধ হয়ে উঠলেন। মানুষের মৃত্যু ও দুর্বিসহ অবস্থাকে বিষয় করে আঁকলেন মোটা কালো রেখায় অনেক ছবি। যা পরবর্তীকালে দুর্ভিক্ষের চিত্র নামে পরিচিত হলো। রাতারাতি শিল্পীর নাম ছড়িয়ে পড়ল সারা ভারতে।

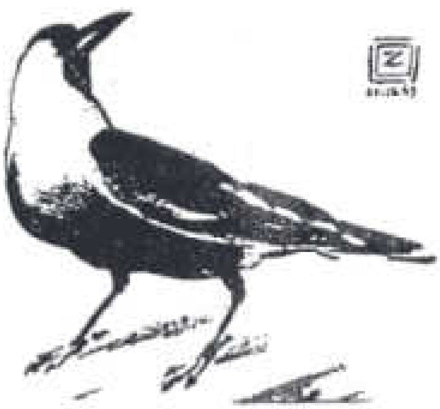

জয়নুলের আঁকা 'কাক'

ভারতের বাইরেও অনেক উন্নত দেশে শিল্পী জয়নুলের দুর্ভিক্ষের চিত্র বিষয়ে নামকরা লোকেরা পত্রপত্রিকায় তাঁর প্রশংসা করে লিখলেন। শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিন বেঁচেছিলেন ৬২ বছর।

সবসময় কর্মসচল ছিলেন তিনি। হঠাৎ করেই দুরারোগ্য ফুসফুসের ক্যান্সার রোগে আক্রান্ত হয়ে ১৯৭৬ সালের ২৮শে মে মৃত্যুবরণ করেন। শেষ বয়সে লোকশিল্পের জাদুঘর গড়ে তোলার কাজ করে যাচ্ছিলেন। বাংলার পুরোনো রাজধানী সোনারগাঁয়ে এই লোকশিল্পের জাদুঘর। শুরু করেছিলেন কিন্তু শেষ করতে পারেননি।

শিল্পাচার্যের শ্রেষ্ঠ শিল্পকর্মগুলোর নাম– দুর্ভিক্ষের চিত্র–১৯৪৩, সংগ্রাম, মই দেয়া, গরুর গাড়ি, গুনটানা, সাঁওতাল, দুমকার ছবি, প্রসাধন,

জয়নুলের আঁকা গরু

পাইন্যার মা, নবান্ন (৬০ ফুট দীর্ঘ স্ক্রল) মনপুরা-৭০ (২০ ফুট দীর্ঘ স্ক্রল)। স্বাধীনতা যুদ্ধকে বিষয় করে এঁকেছেন 'মুক্তিযোদ্ধা' নামের ছবি। তাঁর ছবির সংগ্রহ রয়েছে জাতীয় জাদুঘরে, ময়মনসিংহে জয়নুল সংগ্রহশালায় এবং দেশে-বিদেশে ব্যক্তিগত ও প্রাতিষ্ঠানিক সংগ্রহশালায়। শিল্পাচার্য তাঁর সারা জীবনে অনেক পুরস্কার, সম্মান ও শ্রদ্ধা অর্জন করেছেন। বিশ্বের বহু দেশে তিনি আমন্ত্রিত হয়েছেন। দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে ডি লিট উপাধি দেন। বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক জাতীয় অধ্যাপকের সম্মান লাভ করেন।

শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিনের আঁকা 'দুর্ভিক্ষ'-১৯৪৩

জয়নুল আবেদিনের আঁকা দুর্ভিক্ষ ১৯৪৩-এর একটি ছবি

পাঠ : ৯

কামরুল হাসান

জীবনের পঞ্চাশ বছর সময়কাল তিনি অসংখ্য ছবি এঁকেছেন। প্রতিদিনই তিনি ছবি আঁকতেন। আর একটি-দুটি নয়, অনেক। একটা হিসাব ধরা যাক- প্রতিদিন ৫টি করে ড্রইং করলে ৫০ বছরে দাঁড়ায় প্রায় ১ লক্ষ ড্রইং। হ্যাঁ, তাঁর মতো এত বেশি ড্রইং সারা বিশ্বের আর কোনো শিল্পী করেছেন কিনা জানা যায়নি। ড্রইংয়ে তাঁর দক্ষতা তুলনাহীন। আর্ট ইনস্টিটিউটের তিনিও একজন প্রতিষ্ঠাতা শিক্ষক। প্রথম জীবনে খুবই নিষ্ঠা নিয়ে অনেক শিল্পীদের গড়ে তুলেছেন। পরবর্তীকালে দীর্ঘদিন ধরে গড়ে তোলেন নকশা কেন্দ্র। নকশা কেন্দ্রের পরিচালক ছিলেন। একদল শিল্পী নিয়ে অসংখ্য নতুন নতুন নকশা তৈরি করেন তাঁতিদের জন্য ও অন্যান্য কারুশিল্পীদের জন্য।

কামরুল হাসানের আঁকা নিজের মুখ

জন্ম ২রা ডিসেম্বর, ১৯২১ কলকাতায়। কলকাতা আর্ট স্কুলে চিত্রকলায় শিক্ষা লাভ করেন। তরুণ বয়সেই ব্রতচারী আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়েন। ১৯৩৯ থেকে ১৯৪৮ পর্যন্ত এই আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে যুক্ত ছিলেন। ব্রতচারী আন্দোলন হলো খাঁটি বাঙালি হিসেবে নিজেকে তৈরি করা এবং অন্যকেও

১০৩৫

উদ্বুদ্ধ করা। অন্যদিকে শিশু–কিশোরদের খাঁটি বাঙালি ও উপযুক্ত নাগরিক হিসেবে গড়ে তোলার জন্য 'মুকুল ফৌজ' গড়ে তোলেন। তিনি ছিলেন মুকুল ফৌজের সর্বাধিনায়ক (১৯৪৬–৫১)। শরীর চর্চায়ও তার সুনাম ছিল। সুন্দর দেহ ও সুস্বাস্থ্যের জন্য ১৯৪৫ সালে মি. বেঙ্গল উপাধি ও পুরস্কার লাভ করেন।

কামরুল হাসানের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য কাজ স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় আঁকা ছবি–ইয়াহিয়ার জানোয়ারের মতো মুখ। এটি একটি পোস্টারচিত্র। যার মধ্যে লেখা ছিল এই জানোয়ারদের হত্যা করতে হবে। ইয়াহিয়ার মুখ জানোয়ার আকৃতির। যে লক্ষ লক্ষ বাঙালির হত্যার হোতা। তাঁর এই পোস্টারচিত্র আঁকার গুণে মুক্তিযুদ্ধের জন্য ছিল উৎসাহ ও প্রেরণার এক অস্ত্র। তাই একটি ছবিই কাজ করেছে অস্ত্রের–লক্ষ মেশিনগানের।

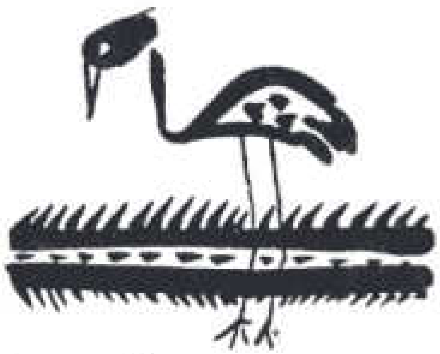

কামরুল হাসানের আঁকা : জেলে ও পাখি

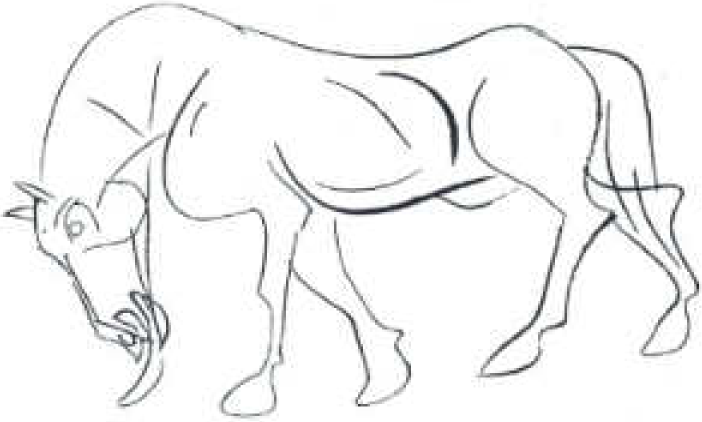

কামরুল হাসানের একটি ড্রইং : ঘোড়া

কামরুল হাসানের বিখ্যাত পোস্টারচিত্র
মুক্তিযুদ্ধ–৭১–এর জন্য আঁকা

কামরুল হাসান তাঁর ছবি আঁকা, লেখা, বক্তৃতা অর্থাৎ সব রকম কাজের মধ্য দিয়ে অন্যায় ও অবিচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করতেন। কবিদের এমনি এক প্রতিবাদী কবিতার সভায় সভাপতিত্ব করার সময় ১৯৮৮ সালের ২রা ফেব্রুয়ারি হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে অনুষ্ঠানের মধ্যেই মৃত্যুবরণ করেন। কামরুল হাসান বাংলাদেশের জাতীয় পতাকার রূপকার এবং বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় প্রতীকের নকশা নির্মাণ করেন। সারা জীবনে তিনি অনেক উল্লেখযোগ্য কাজ করেছেন। সামাজিক ও রাষ্ট্রীয়ভাবে অনেক সম্মান, শ্রদ্ধা ও পুরস্কার পেয়েছেন।

তাঁকে একুশে পদকে ভূষিত করা হয়। তাঁর বিখ্যাত ছবিগুলো হলো নবান্ন, উঁকি দেয়া, তিনকন্যা, বাংলার রূপ, জেলে, পেঁচা, নাইওর, শিয়াল, বাংলাদেশ, গণহত্যার আগে ও পরে ইত্যাদি। তাঁর অনেক ছবি সংগ্রহ রয়েছে বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরে।

পাঠ : ১০

আনোয়ারুল হক

শিল্পী আনোয়ারুল হক

শিল্পকলার একজন নিবেদিত প্রাণ ও শিক্ষক হিসেবে শিল্পী আনোয়ারুল হক খ্যাতি অর্জন করেন। প্রতিটি ছাত্রকে তিনি হাতে ধরে শেখাতেন। তাঁর সারা জীবন কাটে চারুকলা ইনস্টিটিউটে শিক্ষকতা করে। তিনি কয়েকবার চারুকলা ইনস্টিটিউটের অধ্যক্ষের দায়িত্ব পালন করেন। ফাঁকে ফাঁকে কিছু চিত্রকলা করে রেখে গেছেন। জলরঙে সুন্দর ছবি আঁকায় তাঁর খ্যাতি ছিল।

তিনি জন্মগ্রহণ করেন আফ্রিকার উগান্ডায়। ছেলেবেলা সেখানেই কাটে। শিল্পকলা শিক্ষাগ্রহণ করেন কলকাতা আর্ট স্কুলে। তারপর সেখানেই তরুণ বয়সে শিক্ষকতায় যোগ দেন। তারপর ১৯৪৮ সালে ঢাকায় আর্ট ইনস্টিটিউটে যোগ দিয়ে মৃত্যু পর্যন্ত উক্ত প্রতিষ্ঠানেই শিক্ষকতা করে গিয়েছেন। তিনি ১৯৮২ সালে মৃত্যুবরণ করেন।

সুলতান নিজেই এঁকেছেন নিজের প্রতিকৃতি

পাঠ : ১১

এস. এম. সুলতান

একজন খেয়ালি মানুষ ও বৈশিষ্ট্যময় চিত্রকলার শিল্পী হিসেবে খ্যাতি অর্জন করেছেন। তাঁর ছবির বিষয় বাংলাদেশের গ্রামজীবন, চাষবাস, কৃষক, জেলে ও খেটে খাওয়া মানুষ। তাঁর ছবির মানুষেরা বাস্তবের মতো নয়। বলিষ্ঠ দেহ ও শক্তিশালী। তাঁর আঁকার গুণে ছবি বুঝতে কারও কষ্ট হয় না। তিনি তাঁর ছবির মানুষকে ব্যাখ্যা করেন এভাবে, যে কৃষককুলকে আমরা দেখি–তাদের বাইরের রূপ, ভগ্ন স্বাস্থ্য দুর্বল শরীর। আসলে তো তা নয়। কৃষককুল জমি কর্ষণ করে, ফসল ফলায়, খাদ্য জোগায়। তারাই তো আসলে দেশের শক্তি। তাদের ভেতরের রূপটা শক্তিশালী। সুলতান

শিল্পী এস. এম. সুলতানের আঁকা হালচাষ

জন্মগ্রহণ করেন নড়াইলে ১৯২৩ সালে। তাঁর ছেলেবেলা কাটে গ্রামে। তারপর ছবি আঁকা শেখেন কলকাতা আর্ট স্কুলে। তারপর বের হয়ে পড়েন– ঘুরে বেড়ান দেশ-বিদেশে। ছবি আঁকেন, মাঝে মাঝে প্রদর্শনী করেন আবার উদ্দেশ্যহীন ভবঘুরে জীবন। ভারত, পাকিস্তানের অনেক অঞ্চল ঘুরেছেন।

ঘুরেছেন ইউরোপ ও আমেরিকার অনেক দেশ। বেশভূষাও ছিল অন্য সবার থেকে আলাদা। লম্বা চুল, কখনো পা পর্যন্ত কালো আলখাল্লা পরা, কখনো গেরুয়া রঙের চাদর সারা গায়ে জড়িয়ে, কখনো মেয়েদের মতোই শাড়ি ও চুড়ি পরে ঘুরছেন। সন্ন্যাসীর মতোই জীবন কাটিয়েছেন। শেষ বয়সে নড়াইলে নিজের জন্মস্থানে বসবাস করেন। শিশুদের জন্য বিশেষ ধরনের শিক্ষার স্কুল করেন। নাম শিশুস্বর্গ। শিশুরা লেখাপড়া করবে। ছবি আঁকবে, গান গাইবে, প্রকৃতি, গাছপালা, জীবজন্তুর সাথে আপন হয়ে মিশে যাবে। মনের আনন্দে সব শিখবে। জোর করে নয়। সুলতান অনেক পশুপাখি পালতেন। নিজের সন্তানের মতো সেসব পশুপাখিকে যত্ন করতেন। ১৯৯৪ সালে নড়াইলেই একাত্তর বছর বয়সে মৃত্যুবরণ করেন। তাঁর চিত্রকর্ম বাংলাদেশের অমূল্য সম্পদ। শিল্পকলার ক্ষেত্রে তাঁর অবদানের জন্য বাংলাদেশ সরকার তাকে 'রেসিডেন্ট আর্টিস্টের' সম্মান প্রদান করেন। তিনি স্বাধীনতা পদক লাভ করেন।

পাঠ : ১২

শফিউদ্দিন আহমেদ

শিল্পকলার একজন আদর্শ শিক্ষক। পরিচ্ছন্ন রুচি, মার্জিত স্বভাব এবং দক্ষ চিত্রশিল্পী হিসেবে সুনাম অর্জন করেছেন। ছাপচিত্রে, বিশেষ করে কাঠ খোদাই, এচিং, একোয়াটিন্ট, ড্রাই-পয়েন্ট ও ডিপ এচিং মাধ্যমে একজন খ্যাতিমান চিত্রশিল্পী। আর্ট ইনস্টিটিউটের প্রতিষ্ঠা থেকেই শিক্ষকতা করেছেন। বাংলাদেশের অনেক খ্যাতিমান চিত্রশিল্পীকে তাঁর মেধা, শিল্প চেতনা, শিক্ষা দিয়ে শিল্পী হিসেবে গড়ে তুলেছেন। শফিউদ্দিনের জন্ম কলকাতায় ১৯২২ সালে। ছবি আঁকা শেখেন কলকাতা আর্ট স্কুলে। তারপর কিছুদিন সেখানেই শিক্ষকতা করেন। তরুণ বয়সেই তাঁর কাঠ খোদাই ছাপচিত্রের জন্য

সারা ভারতে খ্যাতি অর্জন করেন। তাঁর সে চিত্রগুলো হলো সাঁওতাল মেয়ে, গ্রামের পথে ইত্যাদি।

শিল্পী শফিউদ্দিন আহমেদ তেলরঙেও অনেক ছবি এঁকেছেন। ছাপ পদ্ধতির চিত্রে যেসব বিষয়ে ছবি এঁকেছেন সেগুলো হলো– বন্যা, জেলে, জাল ও মাছবিষয়ক ছবি, নৌকা, ঝড় ইত্যাদি নিসর্গচিত্র ও 'ক্রোধ' বিষয়ে চিত্রকলা। শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিন তাঁর সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন– শিল্পকলার মান বিচারে অর্থাৎ কোন ছবিটি ভালো এবং কোনটির মান উত্তীর্ণ তা সঠিকভাবে বিচার করতে পারেন শিল্পী শফিউদ্দিন আহমেদ। জীবনে অনেক পুরস্কার ও সম্মানসহ একুশে পদক অর্জন করেছেন। ২০শে মে ২০১২ তারিখে এই প্রতিভাবান শিল্পী পরলোকগমন করেন।

শিল্পী শফিউদ্দিন আহমেদের কাঠ খোদাই চিত্র – সাঁওতাল

পাঠ : ১৩

কাজী আবুল কাশেম

একজন সফল পুস্তক চিত্রণের শিল্পী হিসেবে খ্যাতি অর্জন করেন। চল্লিশ ও পঞ্চাশ দশকে বই, পত্রপত্রিকার প্রচ্ছদ ও ইলাস্ট্রেশন (ছবি) তাঁর অবদানে সমৃদ্ধ। 'দোপেয়াজা' ছদ্মনামে রাজনৈতিক ও সামাজিক কার্টুন এঁকে খ্যাতি লাভ করেন। শিশু ও কিশোরদের জন্য লিখেছেন এবং শিশু সাহিত্যে অবদানের জন্য বাংলা একাডেমি পুরস্কার পান। তাঁর জন্ম ১৯১৩ সালে ফরিদপুরে। ছবি আঁকা শিখেছেন নিজের চেষ্টায়, কোনো আর্টস্কুলে পড়ার সুযোগ পাননি। শিশুদের বইয়ে ছবি আঁকার জন্য কয়েকবার জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র থেকে পুরস্কৃত হন এবং স্বর্ণপদক লাভ করেন।

১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনের বিষয়ে এই কার্টুন এঁকেছেন 'দোপেয়াজা' বা শিল্পী কাজী আবুল কাশেম

বাংলাদেশের শিল্পকলার ক্ষেত্রকে সমৃদ্ধ করেছেন এমন শিল্পীর সংখ্যা এখন অনেক। তাঁদের কয়েকজনের কথা এখানে আলোচনা হলো। তাঁদের সমসাময়িক আরও যাঁরা খ্যাতি অর্জন করেছেন তাঁরা হলেন শিল্পী খাজা শফিক আহমেদ, শফিকুল আমিন, হাবিবুর রহমান, সৈয়দ শফিকুল হোসেন প্রমুখ।

এঁদের পরে যেসব শিল্পী চিত্রকলা, ভাস্কর্য, ও অন্যান্য শিল্পকলার ক্ষেত্রে বিশেষ অবদান রাখতে সমর্থ হয়েছেন তাঁরা হলেন শিল্পী মোহাম্মদ কিবরিয়া, আমিনুল ইসলাম, কাইয়ুম চৌধুরী, মুর্তজা বশীর, রশীদ চৌধুরী, আবদুর রাজ্জাক, দেবদাস চক্রবর্তী, হামিদুর রাহমান, নভেরা আহমেদ, সৈয়দ জাহাঙ্গীর, কাজী আবদুল বাসেত, মিতুল কুন্ডু, আনোয়ারুল ইসলাম, মীর মোস্তফা আলী, সমরজিৎ রায় চৌধুরী, হাশেম খান, রফিকুন নবী, আবু তাহের, গোলাম সারোয়ার, মাহমুদুল হক, কালীদাস কর্মকার, হামিদুজ্জামান খান, কাজী গিয়াস, স্বপন চৌধুরী, সৈয়দ আবদুল্লাহ খালিদ, মনিরুল ইসলাম, আবুল বারক আলভী, শাহাবুদ্দিন আহমেদ, আব্দুস সাত্তার, অলক রায়, মনসুরুল করিম, কে এম এ কাইয়ুম, ফরিদা জামান, শওকাতুজ্জামান, শামীম আরা শিকদার, রনজিৎ দাস প্রমুখ।

পাঠ : ১৪

আমাদের শিল্পকলায় ঐতিহ্য ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনা

আমাদের শিল্পকলার ঐতিহ্য মূলত আমাদের লোকজ সংস্কৃতির ধারাবাহিকতা থেকে এসেছে। আবহমান গ্রামবাংলার বৈচিত্র্যময় জীবন আর আমাদের প্রাকৃতিক পরিবেশের সাথে সমন্বয় করে গড়ে উঠেছে আমাদের শিল্প-সংস্কৃতি। এদেশের চিত্রশিল্পের পথিকৃৎ জয়নুল আবেদিন তাই তাঁর চিত্রের মাঝে তুলে ধরেছেন লোকজ ফর্মে সাধারণ মানুষের সরলতা, শুদ্ধতা। লোকশিল্পের তিনি যেসব ফর্ম আবিষ্কার করেছেন, সেসবের দেখা মেলে তাঁর আঁকা তিন মহিলা, গুনটানা, বাংলাদেশের মেয়ে, মাঝি ইত্যাদি ছবিতে। প্রকৃতির রূপ তার কাছে স্নিগ্ধ, কোমল। বাইরের পৃথিবী তাঁর কাছে ধরা দেয় কোমলতা ও সুসমতার ভিত্তিতে। তাঁর সহযোদ্ধা শিল্পী কামরুল হাসান, আনোয়ারুল হক কিংবা এস. এম. সুলতানসহ অনেকেই এ ধারাকে সমৃদ্ধ করেছেন। কামরুল হাসান তাঁর ছবিতে বাংলাদেশের লোকজ ঐতিহ্যকে তুলে ধরেছেন। লোকজ রীতি গ্রামে, মানুষের মনে, স্মৃতিতে, পুরোনো কাহিনিতে জীবন্ত। আর তাকে নির্মাণ করে কামরুল হাসান ছবি এঁকেছেন। কামরুল হাসানের আঁকা সরা, শখের হাঁড়ি, পুতুল এবং তাঁর চিত্রকলা তিনকন্যা, নাইওর এসব ছবির মাঝে বাংলার প্রাচীন লোকসংস্কৃতির ঐতিহ্য খুঁজে পাওয়া যায়। তাঁর ছবিতে লোকজ জীবনের আভাস ফুটে ওঠে। চড়া রং ব্যবহারের সঙ্গে তাঁর প্রকাশভঙ্গিও ছিল লোকঐতিহ্যের সাথে সম্পৃক্ত। কামরুল হাসান তাঁর ছবিতে পূর্বের ফর্ম ভেঙে নতুন সময়ের স্বপ্ন ও যন্ত্রণা, আশা ও হতাশাকে এঁকেছেন।

বাংলা, বাঙালি এবং তাদের পূর্বপুরুষদের জীবনের ধারা খুঁজে পাওয়া যায় আর এক মহান শিল্পী এস. এম. সুলতানের ছবিতে। তাঁর ছবি বাস্তবের মতো নয়। তাঁর ছবির মানুষগুলোর বাইরের রূপের চেয়ে তাঁর অন্তর্নিহিত যে রূপ অর্থাৎ কৃষককুল, যাঁদের শ্রমের বিনিময়ে জীবনধারণ করি আমরা, তাঁদেরকে তিনি এঁকেছেন শক্তিমান ও পেশিবহুল মানুষ হিসেবে।

রশিদ চৌধুরীর চিত্রকলায় আমাদের শিল্পকলার ঐতিহ্যের প্রকাশ ঘটেছে একটু ভিন্নভাবে। রূপকথা, লোককথা, কুসংস্কার, পুঁথির পথ ধরে তিনি যে প্রতীক গড়ে তুলেছেন তাতে মিশে আছে কল্পনার জগৎ, উদ্ভিদ জগৎ ও পশুপাখির জগৎ। তার আঁকা হাতি, ঘোড়া, পাখি, ময়ূর, মোরগ সবই যেন লোককথা ও রূপকথায় বিস্তৃত। ট্যাপেস্ট্রিতে বহু কাজ

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে অবস্থিত শিল্পী নিতুন কুন্ডুর নির্মিত ভাস্কর্য 'সাবাস বাংলাদেশ'

করেছেন তিনি। এঁদের ধারাবাহিকতায় শিল্পী কাইয়ুম চৌধুরী, হাশেম খান ও অন্যান্য শিল্পীরাও চিত্রকলায় ঐতিহ্যকে তুলে ধরেছেন। অন্যদিকে লোকজ ধারায় কাজ করে বাংলাদেশের ঐতিহ্যবাহী পুতুল নাচকে বিষয় করে পাপেট শিল্পকে জনপ্রিয় করেছেন শিল্পী মুস্তাফা মনোয়ার।

বাংলাদেশের লোকজ ঐতিহ্য ইতিহাসের ফসল। ভিত্তি তার কৃষিজ, প্রকাশ তার বিভিন্ন। নকশিকাঁথা, সরা, পুতুল, শীতলপাটি, হাঁড়ি, বাঁশ ও বেতের কাজ হচ্ছে লোকজ শিল্প বা আমাদের ঐতিহ্যের রূপ। আর এর সাথে আছে আমাদের ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান ও বিশ্বাস।

শিল্পকলার এই যে ঐতিহ্য এটা যেমন হাজার বছরের সাংস্কৃতিক ধারাবাহিকতায় চলে এসেছে, তেমনি বায়ান্নর ভাষা আন্দোলন থেকে শুরু করে একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে তৈরি হয়েছে আমাদের এই স্বাধীন সার্বভৌম দেশ, আমাদের লাল সবুজ পতাকা। ত্রিশ লক্ষ শহিদের ত্যাগের বিনিময়ে আমাদের এই মাতৃভূমি। আপামর জনসাধারণের সাথে আমাদের প্রথিতযশা চিত্রশিল্পীরাও সেদিন তাঁদের রং-তুলি নিয়ে পোস্টার, ফেস্টুন, প্লাকার্ডে তদানীন্তন স্বাধীনতা বিরোধী পশ্চিমাগোষ্ঠী হায়েনাদের রূপটি তুলে ধরে উজ্জীবিত করেছিলেন এদেশের মুক্তিকামী মানুষদের। যার নিদর্শন হিসেবে আমরা দেখতে পাই কামরুল হাসানের সেই বিখ্যাত পোস্টার ইয়াহিয়ার ছবি সংবলিত লেখা 'এই জানোয়ারদের হত্যা করতে হবে'। তেমনি স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে এদেশে যেসকল ভাস্কর্য বিশেষ করে অপরাজেয় বাংলা, স্বোপার্জিত স্বাধীনতা, সাবাস বাংলাদেশ, জাগ্রত চৌরঙ্গী, সংশপ্তক এবং শহিদমিনার, স্মৃতিসৌধসহ বাংলাদেশের নানান জায়গায় যেসব ভাস্কর্য ও স্মৃতিস্তম্ভ তৈরি হয়েছে, তার মাঝে প্রতিফলিত হয়েছে আমাদের মুক্তিযুদ্ধের চেতনা-যা যুগ যুগ ধরে এ দেশের ইতিহাস ও ঐতিহ্যকে তুলে ধরবে। মুক্তিযুদ্ধ এবং এর ফলে বদলে যাওয়া পরিস্থিতিতে আমাদের শিল্প-সাহিত্যের অঙ্গনে একটা ব্যাপক পরিবর্তন এসেছে। আমাদের কবিতা, গল্প, উপন্যাস, নাটক ও সংগীতের মতো চিত্রকলার ক্ষেত্রেও মুক্তিযুদ্ধ এসেছে তার বহুমাত্রিক রূপ নিয়ে। আমাদের শিল্পীরা মুক্তিযুদ্ধকে বিষয় করে অজস্র শিল্পকর্ম তৈরি করেছেন এবং করছেন।

কাজ : বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে যেসব ভাস্কর্য তৈরি হয়েছে, তাদের কয়েকটির নাম লেখো।

নমুনা প্রশ্ন

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১। 'সোপেরাজা' কোন শিল্পীর ছদ্মনাম?

ক. রফিকুন নবী   খ. হাশেম খান

গ. কাজী আবুল কাশেম   ঘ. মুস্তাফা মনোয়ার

২। "এই জানোয়ারদের হত্যা করতে হবে" শিরোনামে পোস্টারটি কে অঙ্কন করেন?

ক. কাইয়ুম চৌধুরী   খ. কামরুল হাসান

গ. প্রাণেশ মন্ডল   ঘ. নিতুন কুন্ডু

৩। শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিনের আঁকা 'নবান্ন' ছবির দৈর্ঘ্য কত ছিল?

ক. ৭০ ফুট   খ. ৭৫ ফুট

গ. ৬৫ ফুট   ঘ. ৬০ ফুট

৪। চারুকলা অনুষদ কত সালে প্রতিষ্ঠা হয়?

ক. ১৯৪৮ সালে   খ. ১৯৫৭ সালে

গ. ১৯৫২ সালে   ঘ. ১৯৭০ সালে

৫। 'মই দেয়া' ছবিটি কে অঙ্কন করেন ?

ক. শিল্পী কামরুল হাসান   খ. শিল্পী মুর্তজা বশীর

গ. হাশেম খান   ঘ. শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিন

৬। রেমব্রান্ট কোন দেশে জন্মগ্রহণ করেন?

ক. জার্মানিতে   খ. লন্ডনে

গ. ইতালিতে   ঘ. হল্যান্ডে

৭। 'The Dance' চিত্রটি কোন শিল্পীর শিল্পকর্ম?

ক. মাতিস   খ. রেমব্রান্ট

গ. পাবলো পিকাসো   ঘ. পল সেজান

৮। আধুনিক চিত্রকলার জনক কে?

ক. পল সেজান   খ. পাবলো পিকাসো

গ. মাতিস   ঘ. ভ্যান গঘ

৯। গভর্নমেন্ট ইনস্টিটিউট অব আর্ট-এ প্রথম বর্ষে কতজন ছাত্র ছিল?

ক. ১২ জন   খ. ১৫ জন

গ. ১৪ জন   ঘ. ১৩ জন

১০। 'শিশুস্বর্গ' কে প্রতিষ্ঠা করেন?

ক. এস.এম. সুলতান   খ. কামরুল হাসান

গ. শফিউদ্দিন আহমেদ   ঘ. আনোয়ারুল হক

লিখে জবাব দাও

১। বাংলাদেশে চিত্রশিল্পী ও শিল্পকলার ভূমিকা সম্পর্কে যা জান লেখো।

২। শিল্পাচার্য কাকে বলা হয়? তাঁর সম্পর্কে বিশদভাবে লেখো।

৩। ব্রতচারী আন্দোলন করেছিলেন কোন শিল্পী? তাঁর জীবন ও কর্ম সম্পর্কে বিস্তারিত লেখো।

৪। শিল্পকলার একজন নিবেদিত প্রাণ হিসেবে তিনি খ্যাতি অর্জন করেন। কে তিনি? তাঁর সম্পর্কে লেখো।

৫। তিনি শিল্পকলার মান সঠিকভাবে বিচার করতে পারেন। কোন শিল্পী সম্পর্কে এই উক্তি করা হয়েছে? তাঁর বিষয়ে বিস্তারিত লেখো।

৬। 'শিশু স্বর্গ কী? কোন শিল্পী শিশু স্বর্গ তৈরি করেছেন। শিল্পী সম্পর্কে যা জান লেখো।

৭। বাংলাদেশের খ্যাতিমান ১২ জন শিল্পীর নাম লেখো। এঁদের মধ্যে যে কোনো একজন সম্পর্কে বিস্তারিত লেখো।

৮। আধুনিক চিত্রকলার জনক পল সেজান সম্পর্কে বিস্তারিত লেখো।

৯। শিল্পী রামকিঙ্কর বেইজের কাজের বিষয়বস্তু সম্পর্কে লেখো।

১০। রামকিঙ্করকে প্রাচ্যের আধুনিক ভাস্কর্যের জনক হিসেবে মূল্যায়ন করো।

১১। বিশ্বে আধুনিক ভাস্কর হিসেবে রদ্যাঁর কাজের বৈশিষ্ট্য লেখো।

সংক্ষেপে জবাব দাও

১। শিল্পকলা শিক্ষার প্রথম প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলেন এমন ৬ জন প্রতিষ্ঠাতা শিল্পীর নাম লেখো।

২। শিল্পকলা শেখার প্রথম প্রতিষ্ঠানের নাম কী? কোন সালে প্রথম প্রতিষ্ঠিত হয়?

৩। সমাজ জীবনের কোন কোন ক্ষেত্রে শিল্পকলার শিল্পীদের প্রয়োজন?

৪। 'এই জানোয়ারদের হত্যা করতে হবে' শীর্ষক ছবিটি সম্পর্কে সংক্ষেপে লেখো।

৫। আধুনিক ভাস্কর্যের জনক কে? তাঁর সম্পর্কে সংক্ষেপে লেখো।

৬। 'সোপেরাজা' কী বা কে? সংক্ষেপে লেখো।

৭। রেমব্রান্ট সম্পর্কে সংক্ষেপে লেখো।

তৃতীয় অধ্যায়

বাঙালি লোকজীবনে চারু ও কারুকলা

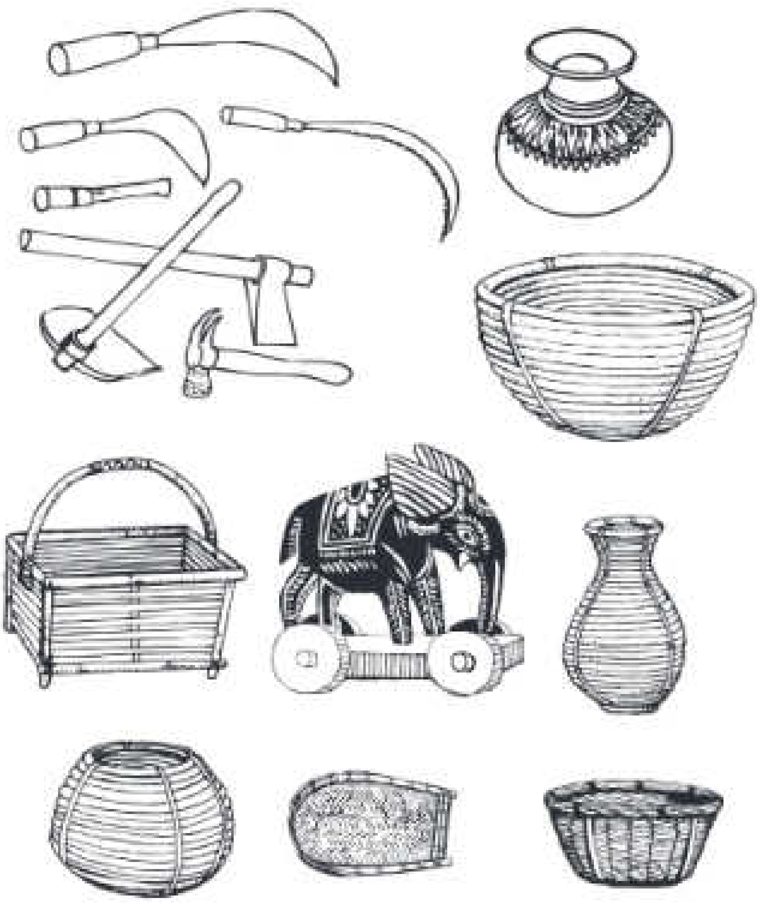

এ অধ্যায় পাঠ শেষে আমরা-

- বাংলার গ্রামীণ জীবনে চারু ও কারুকলার প্রভাব সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারব।
- বিভিন্ন পেশায় চারু ও কারুকলার ভূমিকা বর্ণনা করতে পারব।
- লোকজীবন সম্পৃক্ত বিভিন্ন শিল্পকর্ম সম্পর্কে বর্ণনা করতে ও উদাহরণ দিতে পারব।

পাঠ : ১, ২, ৩, ৪, ৫ ও ৬

লোকায়ত বাংলার জীবন ও সংস্কৃতি

লোকজীবন হলো মানুষের জীবন। সেই মানুষ যখন বাঙালি– অর্থাৎ যারা বাংলা ভাষায় কথা বলি এবং বাংলায় জন্মগ্রহণ করেছি, স্থায়ীভাবেই বাংলাদেশ নামক অঞ্চলে বসবাস করছি তাদের জীবনযাপনে স্বাভাবিকভাবে কিছু বৈশিষ্ট্য রয়েছে। এই বৈশিষ্ট্য হলো চারু ও কারুকলার ব্যবহার ও অন্যান্য সংস্কৃতি। তবে অঞ্চলভিত্তিক লোকজীবনে কিছু ভিন্ন ভিন্ন রূপ রয়েছে। যেমন– গ্রামের জীবনযাপনে এবং শহরের জীবনযাপনে বৈপরিত্য রয়েছে। আবার গ্রামের জীবনযাপন ও প্রাকৃতিক পরিবেশগত কারণে পোশাক–পরিচ্ছদে বিভিন্নতা, ঘরবাড়ি তৈরিতে বিভিন্নতা, চাষবাস ইত্যাদিতে বিভিন্নতা লক্ষ করা যায়। আবার মিলও আছে অনেক। আদিবাসী ও ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর লোকজীবনেও চারু ও কারুকলার ব্যবহার অনেক। কিছু উদাহরণ উল্লেখ করলে বিষয়টি বুঝতে সহজ হবে। শহরের ঘরবাড়ি বেশিরভাগই ইট, লোহা ও কাঠের তৈরি। আজকাল যথাযথ গুরুত্ব দিয়ে আসবাবপত্র এবং বসবাসের অন্যান্য প্রয়োজনীয় উপকরণগুলো একটির সঙ্গে আরেকটির সামঞ্জস্য করে তৈরি করা হয়। খাওয়াদাওয়ার টেবিল, চেয়ার, খাট, পালং, আলমারি, পোশাক–পরিচ্ছদ রাখার আলমারি, বই রাখার আলমারি, সোফাসেট, দরজা, জানালা সর্বত্রই চারু ও কারুকলার প্রতিফলন ঘটানো হয়। নানারকম নকশা করে এসব আবাসিক বস্তুসামগ্রীর শিল্পরূপ দেয়া হয়। কাঠের দরজা, জানালা ও খাট–পালং-এ কারুশিল্পীরা খোদাই করে ফুল, পাখি, লতাপাতা ইত্যাদি বিষয়ের চিত্র ফুটিয়ে তোলেন। আবার কিছু দরজা ও অন্যান্য আসবাবে জ্যামিতিক নকশা ও রেখার সমন্বয়ে শিল্পরূপ দেয়া হয়। দরজা–জানালায় যেসব পর্দা টাঙানো হয় তার রং, নকশার ছাপ, লতাপাতা ও প্রাকৃতিক দৃশ্য চারু ও কারুশিল্পীরাই ফুটিয়ে তোলেন। কখনো তাঁতি বুননের মাধ্যমে কখনো কারুশিল্পী নানারকম কাঠ ও রাবারের ব্লক তৈরি করে ছাপ তুলে তা করে থাকেন। বাড়িঘরের অন্যান্য সাজসজ্জায় সর্বত্রই চারু ও কারুশিল্পীদের কাজ ব্যবহার করা হয়। যেমন– চিত্রিত কাঠের ঘোড়া, হাতি, বর–কনে, পেঁচা, পাখি ইত্যাদি। টেরাকোটা ফলক, পোড়ামাটির ছোটো-বড়ো টেপা পুতুল, হাতি, ঘোড়া মানুষসহ পোড়ামাটির ফুলদানি, নানা আকার ও আকৃতির পাত্র, শখের হাঁড়ি, লক্ষীসরা, পাটের শিকা, থলে ও অন্যান্য কারুশিল্প নকশিকাঁথা ইত্যাদি। এসব শিল্পকর্ম বেশিরভাগই বাংলার গ্রাম্য অঞ্চলের মানুষেরা করে থাকে। কিছু তৈরি হয় চারু ও কারুকলা চর্চার স্বাভাবিক কারণে ও স্বভাবগত অভ্যাসে। আমরা এসব শিল্পকে তাই নাম দিয়েছি লোকশিল্প। আবার জীবনযাপনের প্রয়োজনে বাঁশ, বেত, পাট ইত্যাদি উপকরণে এবং মাটির হাঁড়ি–পাতিল যারা বানান লোহা, পিতল, কাঁসার বিভিন্ন ব্যবহারিক বস্তুসামগ্রী যারা তৈরি করেন (দা, কুড়াল, লাঙল, কোদাল, থালাবাটি, কলসি ইত্যাদি) তাঁদের নাম কারুশিল্পী।

বর্তমানে লোকশিল্প ও কারুশিল্পের বিশেষ কিছু বস্তুসামগ্রী বাণিজ্যিকভাবে দেশে–বিদেশে বিস্তারের জন্য শহরে বিশেষ ব্যবস্থায় তৈরি হয়ে থাকে।

প্রথাগত শিক্ষায় শিক্ষিত চিত্রশিল্পীদের আঁকা চিত্রকর্ম দেয়ালে টাঙিয়ে এবং ভাস্করদের তৈরি সিমেন্ট, পাথর, ব্রোঞ্জ ও কাঠের ছোট ভাস্কর্য সাজিয়ে চারু ও কারুশিল্পকে সুন্দর জীবনযাপনে প্রয়োজনীয় করে তোলা হচ্ছে।

গ্রাম : গ্রামের ঘরবাড়ির আদল শহর থেকে যথেষ্ট ভিন্ন। পেশাগত ও অর্থনৈতিক কারণে গ্রামের ঘরবাড়ি তৈরি হয় মাটি, কাঠ, টিন, ছন, পাটখড়ি, খড়, গোলপাতা, নারকেলপাতা ইত্যাদি দিয়ে। গ্রামের কৃষিজীবী মানুষ, জেলে, মাঝি, কামার, কুমার তাঁরাই নিজেদের প্রয়োজনমতো এবং পরিবেশের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিজেদের বসবাসের উপযোগী ঘরবাড়ি তৈরি করেন। নিজেরা স্থাপত্যকলায় পারদর্শী না হলেও স্বাভাবিক চিন্তায় এসব ঘরবাড়িতে গ্রামের পেশাজীবী মানুষদের

শিল্পবোধের ও সৌন্দর্যের পরিচয় পাওয়া যায়। দোচালা ঘর, চৌচালা ও আটচালা ঘরবাড়িতে বাঁশ, বেত ও কাঠের নানারকম শিল্পকর্মের মাধ্যমে চারু ও কারুকলার প্রকাশ ঘটে।

ঝড়, বন্যা, ইত্যাকার প্রাকৃতিক দুর্যোগ থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য আজকাল গ্রামেও ইটের ঘরবাড়ি তৈরি হচ্ছে। দালানকোঠা হলেও শহরের মতো না হয়ে গ্রামীণ প্রাকৃতিক পরিবেশকে মনে রেখে সেগুলো তৈরি হয়।

গ্রামের লোকজীবনে যেসব পেশা রয়েছে তাদের জীবনযাপনে যেসব বস্তুসামগ্রী প্রয়োজন হয় তাতে কম বেশি চারু ও কারুশিল্পের প্রয়োগ দেখা যায়। এসব বস্তুসামগ্রী শহুরে জীবনেও কিছু কিছু ব্যবহার হয়ে থাকে। যা আগে উল্লেখ করেছি। যেমন দা, কুড়াল, কোদাল, কাস্তে, খন্তা, লাঙল, জোয়াল, মই এগুলো কামারেরা লোহা পিটিয়ে তৈরি করে। জোয়াল ও মই অবশ্য কাঠ ও বাঁশের তৈরি। বাঁশ দিয়ে তৈরি হয় ছোটো–বড়ো নানা আকৃতির টুকরি, কুলা, ঝাঁকা, খালুই, মাছ ধরার চাই। মাছ ধরার চাই তৈরিতে চারু ও কারুকলার প্রকাশ বেশ সুন্দর। কারুশিল্পের উন্নত নিদর্শন হিসেবে চাই সমাদর পেয়ে এসেছে। মুর্তা গাছের বাকল দিয়ে তৈরি হয় শীতলপাটি। পাটিতেও কারুশিল্পীরা বুনটের মাধ্যমে নকশা ও চিত্র ফুটিয়ে তোলেন।

বাংলাদেশের আদিবাসী ও ক্ষুদ্র নৃ–গোষ্ঠীর মানুষরা ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে বিভিন্ন অঞ্চলে। রাজশাহী, দিনাজপুর অঞ্চলে রয়েছে সাঁওতাল, ওঁরাও ও রাজবংশীরা। ময়মনসিংহ, নেত্রকোনা, শেরপুরে বসবাস করে গারো ও কোচ। খাসিয়া, মনিপুরী, ত্রিপুরারা বাস করে সিলেট অঞ্চলে। বরিশালে বাস করে রাখাইন সম্প্রদায়ের মানুষ। পার্বত্য চট্টগ্রাম জুড়ে রয়েছে অনেক আদিবাসীদের বসবাস। এরা হলো– চাকমা, মারমা, তঞ্চঙ্গা, বম, বোমাং, ত্রিপুরাসহ আরো অনেক। এরা উঁচু নিচু পাহাড়ে ও পাহাড়ের পাদদেশে বসবাস করে। পরিবেশের সঙ্গে তাল মিলিয়ে এরা নিজেদের বসবাসের ঘর তৈরি করে। যা স্থাপত্য ও কারুশিল্পের সুন্দর প্রকাশ। এরা চাষবাস করে ঢালু পাহাড়ের গায়ে। চাষের পদ্ধতির নাম জুম চাষ। নিজেরাই বিশেষ করে মেয়েরা ঘরে বসে তাঁতে নিজেদের পরিধেয় পোশাক তৈরি করে। আদিবাসীদের লোকজীবনে সর্বত্রই চারু ও কারুকলার প্রকাশ বিদ্যমান।

বাংলাদেশে চারু ও কারুকলার চর্চা বিভিন্ন শিল্পবস্তু তৈরি এবং শৈল্পিক বস্তুসামগ্রীর ব্যবহার লোকায়ত। অর্থাৎ জীবনযাপনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে বাঙালিরা চারু ও কারুশিল্পীদের তৈরি করা বস্তুসামগ্রী জাতি, ধর্ম ও গোত্র নির্বিশেষে সবাই ব্যবহার করে এসেছে। সব ধর্মের মানুষই শিল্পকর্ম তৈরি করে থাকে।

বাংলাদেশ ধর্মনিরপেক্ষ দেশ। সাধারণ মানুষ অসাম্প্রদায়িক। মুসলমান, হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রিষ্টান ধর্মের মানুষ পাশাপাশি একই সঙ্গে বসবাস করার ঐতিহ্য দীর্ঘকালের। একে অপরের কাজে সহযোগী। ভাগাভাগি করে অনেক কাজই সমাধা করে বিভিন্ন ধর্মের প্রধানরা।

একজন হিন্দু কামারের তৈরি দা, কুড়াল, খন্তা, কাঁচি ইত্যাদি মুসলমান, খ্রিষ্টান ও বৌদ্ধরা নির্দ্বিধায় ব্যবহার করে। একজন কুমার–যে হিন্দু ধর্মের মানুষ, তাঁর তৈরি মাটির হাঁড়ি–পাতিলে রান্না করে খেতে মুসলমান, বৌদ্ধ ও খ্রিষ্টান ধর্মের মানুষের কোনো আপত্তি নেই। তাঁর তৈরি মাটির কলসি থেকে সবাই আনন্দের সঙ্গেই পানি পান করে।

আদিবাসী মেয়েরা তাঁতে তাদের সুন্দর পোশাকের কাপড় বুনে নেয়। রং, নকশায় ও বৈচিত্র্যে আদিবাসীদের তৈরি কাপড় ও পোশাক সমতলের সব ধর্মের মানুষদের কাছেই আকর্ষণীয়। বিশেষ করে তাদের তৈরি চাদরের কদর সারা বাংলাদেশে। সেই চাদর গায়ে জড়িয়ে হিন্দু, মুসলমান, খ্রিষ্টান, বৌদ্ধ সব লোকই সমান আরাম পায় এবং ঠান্ডা থেকে সমানভাবেই রেহাই পায়। সোনা, রুপার অলংকারে নিখুঁতভাবে নকশা খোদাই করার কাজে বাংলাদেশের কারুশিল্পীরা

১৩৫

খ্যাতি অর্জন করেছে। সব ধর্মের মানুষের মধ্যেই অলংকার শিল্পের কারিগর বা কারুশিল্পী রয়েছে। একজন মানুষ অনেক খুঁজে ও অনেক বেছে তার পছন্দের অলংকারটি সংগ্রহ করে। তার পছন্দ, রুচি ও শিল্পবোধই তাকে বাছাই করতে সাহায্য করে। তার বাছাই করা অলংকারের নিখুঁত নকশা খোদাই ও সুন্দর কারুকাজের জন্য তিনি অলংকার শিল্পীকে সম্মান দেখান, প্রশংসা করেন। শিল্পের জন্যই তিনি কারিগরকে প্রশংসা করেন। অন্য কোনো কারণে নয়।

বাংলাদেশে ধর্মভিত্তিক কয়েকটি উৎসব হয়ে থাকে। যেমন–মুসলমানদের ঈদ উৎসব, হিন্দুদের দুর্গাপূজা, বৌদ্ধদের বুদ্ধপূর্ণিমা, খ্রিষ্টানদের বড়দিন। ধর্মভিত্তিক হলেও অন্যান্য ধর্মের মানুষ নানাভাবে সেই উৎসবে অংশগ্রহণ করে।

বাংলাদেশের প্রায় ৯৯ ভাগ মানুষ বাংলা ভাষায় কথা বলে। আদিবাসীদের নিজস্ব ভাষা আছে। তা সত্ত্বেও তারা বাংলা ভাষায়ও কথা বলে। এই বাংলা ভাষার কারণে আমাদের সাহিত্য, গান, নাটক, যাত্রাপালা এবং অন্যান্য সংস্কৃতি লোকায়ত বৈশিষ্ট্য নিয়ে বিরাজমান। সব ধর্মের মানুষদের মধ্যেই তা বিস্তৃত। চারু ও কারুকলা বিষয়টিও সমানভাবে লোকায়ত।

স্বৈরাচারী পাকিস্তান সরকারের বিরুদ্ধে বাঙালিরা একতাবদ্ধ হয়ে ২৩ বছর ধরে সংগ্রাম করেছে নিজেদের অধিকার আদায়ের জন্য। বাঙালিরা বাংলাভাষা, চিরায়ত সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য ও লোকায়ত বৈশিষ্ট্যকে ধ্বংস করে দিয়ে সেখানে বিজাতীয় ভাষা, পাকিস্তানি উদ্ভট সংস্কৃতি তথা ধর্মের দোহাই দিয়ে সাম্প্রদায়িক চিন্তা–চেতনা জোরজুলুম করে চাপিয়ে দিতে চেয়েছিল। কিন্তু পূর্ব বাংলার বাঙালিরা এক হয়ে রুখে দাঁড়িয়েছিল। ১৯৭১ সালে সামান্য যুদ্ধাস্ত্র নিয়েই পাক সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছিল। নয় মাস যুদ্ধ করে বিপুল অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত শক্তিশালী পাকিস্তানি সেনাদের পরাস্ত করে বাংলাদেশের স্বাধীনতা ছিনিয়ে এনেছিল। বাঙালির লোকায়ত বৈশিষ্ট্যও ভাষা, সাহিত্য, শিল্প–সংস্কৃতির মিলিত চেতনাই ছিল প্রধান মানসিক শক্তি ও মনোবল।

দীর্ঘকাল ধরে বাঙালিরা বাংলা নববর্ষ ১লা বৈশাখকে অনেক ঘটা করে পালন করে এসেছে। পহেলা বৈশাখ এখন বাংলাদেশে সর্বশ্রেষ্ঠ উৎসব। শহরে, গ্রামে সর্বত্র এই উৎসব ও মেলা বেশ কিছুদিন ধরে চলতে থাকে। পহেলা বৈশাখের উৎসব অনুষ্ঠানের প্রস্তুতি দুই–তিন মাস আগে থেকেই চলতে থাকে। তুলিরা তাদের দল গঠন করে, শিশুদের আনন্দের খেলা ঝুলন্ত চেয়ার ঘূর্ণি, যাত্রাপালা, নাচ, গান অভিনয় মঞ্চে নিজেদের তৈরি করে। অন্যদিকে কুমার তাদের চাকায় নানারকম মাটির পাত্র তৈরি করে পুড়িয়ে নেয়, শখের হাঁড়ি, লক্ষীসরা, কাঠ ও বাঁশের অনেক কারুশিল্প ও খেলনা তৈরি হয় মেলার জন্য। যেমন– রঙিন হাতি, ঘোড়া, বর–কনে, একতারা, দোতরা, তবলা, ছোটো–বড়ো অসংখ্য ঢোল, বাঁশের বাঁশি নানারকম খেলনা ইত্যাদি। গ্রামীণ জীবনকে বিষয় করে চারুশিল্পীদের আঁকা নানারকম পট (চিত্র) গাজীরপট খুবই বিখ্যাত চারুশিল্প।

ঢাকা শহরে বাংলা নববর্ষকে প্রথম আহ্বান জানানো হয় রমনার সবুজ চত্বরের বটতলায়। পহেলা বৈশাখে সূর্য ওঠার আগে লক্ষ মানুষের সমাবেশ ঘটে এই বটমূলে। শিশু, মহিলা, তরুণ–তরুণীসহ সব বয়সের মানুষ নতুন নতুন পোশাকে সুন্দর সব সাজে অপেক্ষা করে কখন নতুন বছরের সূর্য উঠবে। শুদ্ধ সংস্কৃতিচর্চায় শক্তিশালী ভিত্তি দাঁড়ানো প্রতিষ্ঠান ছায়ানট প্রতিবছর আয়োজন করে এই উৎসবের। সূর্য ওঠার সঙ্গে সঙ্গে ছায়ানটের শিল্পীরা গেয়ে ওঠে– 'এসো হে বৈশাখ–এসো এসো...'

ছায়ানটের শিল্পীদের সঙ্গে কণ্ঠ মিলায় হাজার হাজার কণ্ঠ—না লক্ষ কণ্ঠ।

একের পর এক গান চলতে থাকে– মানুষের প্রাণের গান, ভালোবাসার গান, উদ্দীপনার গান, বেঁচে থাকার গান। প্রাণ ভরে উপভোগ করে ছায়ানটের এই বিশাল আবেদন, বিশাল আয়োজন।

পহেলা বৈশাখের প্রভাত সূর্যকে আহ্বান জানিয়ে আরো কিছু সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান অনুরূপ অনুষ্ঠান ও উৎসবের আয়োজন করে থাকে। এরা হলো ঋদ্ধি সাংস্কৃতিক গোষ্ঠী, উদীচী, রবিরাগ, সুরেরধারাসহ আরো অনেক প্রতিষ্ঠান।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় চারুকলা অনুষদের বাংলা নববর্ষে 'মঙ্গল শোভাযাত্রা'

চারুকলার শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা অনুষদে প্রতিবছর আয়োজন করা হয় বাংলা নববর্ষ উপলক্ষেও বিশাল শোভাযাত্রা (মঙ্গল শোভাযাত্রা)। ঢুলীদের ঢোলের তালে তালে নাচতে নাচতে আনন্দ–উল্লাসে এগুতে থাকে শোভাযাত্রা। চারু ও কারুশিল্পীরা তৈরি করে লোকশিল্পের আদলে বিভিন্ন অঙ্গভঙ্গির সব ভাস্কর্য। হাতি, ঘোড়া, কুমির, পেঁচা, সাপ, মোরগ, মাছ, ফুল, পাখিসহ অনেক কিছু। বিশাল আকারে তৈরি হয় লোকশিল্পের এই ভাস্কর্য, যা প্রতীকী। কিছু আছে কুটিল, লোভী, আলবদর, রাজাকারদের আদল, কিছু আছে ভালো, সৎ মানুষের আদল, যারা মানুষের মঙ্গল চায়। চারু ও কারুশিল্পীদের এই বর্ণাঢ্য বাংলা নববর্ষের শোভাযাত্রা দেশের গণ্ডি ছাড়িয়ে বিদেশের মানুষের কাছেও সমাদৃত।

বাংলা নববর্ষের উৎসব সারা বাংলায় গ্রামে–গঞ্জে–শহরে আনন্দ–উল্লাস নিয়ে পালিত হচ্ছে।

লোকায়ত ও সর্বজনগ্রাহ্য অন্যান্য উৎসব হলো– একুশে ফেব্রুয়ারি উদ্‌যাপন। ভাষাশহিদদের প্রতি শ্রদ্ধা ও সম্মান জানাবার প্রতীকী খালি পায়ে প্রভাতফেরি, রাস্তায় ও শহিদমিনার চত্বরে আলপনা আঁকা। প্রতি বছরই চারুশিল্পীরা আলপনা আঁকে, আলপনা আঁকা রাস্তায় খালি পায়ে মানুষ হেঁটে যায় ফুল হাতে শহীদমিনারের দিকে–কণ্ঠে থাকে শ্রদ্ধা ও ভালোবাসার গান–'আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারি, আমি কি ভুলিতে পারি....'

১৯৭১ সালের ২৫শে মার্চ কালরাতে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী হত্যাযজ্ঞে মেতে উঠলে বাঙালিরা অস্ত্র হাতে তুলে নিয়ে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ে। দেশকে স্বাধীন করে ১৬ই ডিসেম্বর ১৯৭১ সালে। এই দিনটি বাঙালি জাতি উৎসবমুখর পরিবেশে উদ্‌যাপন করে থাকে।

বাংলাদেশের সর্বত্র অনেক নদী। এই নদীকে ঘিরে যে উৎসব হয় তা হলো নৌকাবাইচ। কারুশিল্পীরা সুন্দর ও চমৎকার সব আদলে ও নকশায় কাঠের নাও তৈরি করে। নৌকাবাইচ উৎসবের সঙ্গে রয়েছে–তালের গান, ঢোল, বাঁশি ইত্যাদি।

লোকায়ত বাংলার জীবন ও সংস্কৃতিতে উল্লেখিত উৎসব ও আনন্দ অনুষ্ঠানগুলো (পহেলা বৈশাখ, নবান্ন উৎসব, বসন্ত উৎসব, একুশে ফেব্রুয়ারি, বিজয় দিবস, স্বাধীনতা দিবস, নৌকাবাইচ) বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ। এই উৎসবগুলোর মাধ্যমে অন্যান্য সাংস্কৃতিক বিষয়ের সঙ্গে সমন্বয় করে চারু ও কারুকলার প্রকাশ ও বিকাশ ঘটে থাকে।

পাঠ : ৭, ৮, ৯ ও ১০

পেশাগত জীবনে চারু ও কারুকলার প্রয়োগ

লোকশিল্প বলতে আমরা যে শিল্পকলাকে চিহ্নিত করি তা আমাদের গ্রামগঞ্জের শিল্পীরা একসময় যথাযথ পেশা হিসেবে বিচার করত না। যেমন নকশিকাঁথা গ্রামের মেয়েদের সুখ–দুঃখের কাহিনি বা অন্য কোনো গল্প সে মনের মাধুরী মিশিয়ে রঙিন সুতো ও সুচ দিয়ে দিনের পর দিন সময় নিয়ে কাঁথায় ফুটিয়ে তুলত। এক-একটি সময় ঠিক করে সে নকশিকাঁথা নিয়ে বসত। এই কাঁথা বিক্রি করা তার পেশা ছিল না। কাঁথা নিজের জন্য বা কোনো প্রিয় মানুষের জন্যই সে তৈরি করত।

পোড়ামাটির ফলকচিত্র বা টেরাকোটা

একইভাবে শখের হাঁড়ি, টেরাকোটা, টেপা পুতুল ও পাটের শিকা, হাতপাখা ইত্যাদি নিজেদের আনন্দেই শিল্পীরা করত। ধীরে ধীরে লোকজীবনে এসব শিল্পের কদর বাড়তে থাকে। বাণিজ্যিকভাবে বাংলার অনেক লোকশিল্প ও কারুশিল্পের সঙ্গে মিশ্রিত রূপ নেয়। নকশিকাঁথার জনপ্রিয়তা এখন দেশে ও বিদেশে সর্বত্র। তাই নকশিকাঁথাকে কেন্দ্র করে কিছু পেশাজীবী শিল্পী তৈরি হয়েছে।

এদের মধ্যে গ্রামের মেয়েরা যেমন আছে তেমনি শহরের মেয়েরাও রয়েছে। এমনকি চারুকলা থেকে পাশ করা শিল্পীরাও নকশিকাঁথা তৈরি করাকে শিল্পকর্মের পেশা হিসেবে গ্রহণ করেছে। গ্রামীণ জীবনে– কামার, কুমার, তাঁতি এরা কারুশিল্পে পেশাজীবী। বাঁশ, কাঠ, খড়, পাতা ও পাট দিয়ে নানারকম খেলনা, শখের জিনিস এমনকি লোকজীবনে ব্যবহারের অনেক বস্তুসামগ্রী তৈরিতে স্বশিক্ষিত শিল্পী এবং চারুকলার শিক্ষাপ্রাপ্ত শিল্পীরা পেশা হিসেবে গ্রহণ করেছে। নতুন নতুন ডিজাইনে ও চিত্র-বিচিত্র সাজসজ্জায় পোশাকশিল্পকে অনেক আধুনিক আকর্ষণীয় করে তুলেছে চারুকলার শিল্পীরা। যা দেশের গণ্ডি পেরিয়ে বিদেশেও সুনাম অর্জন করেছে।

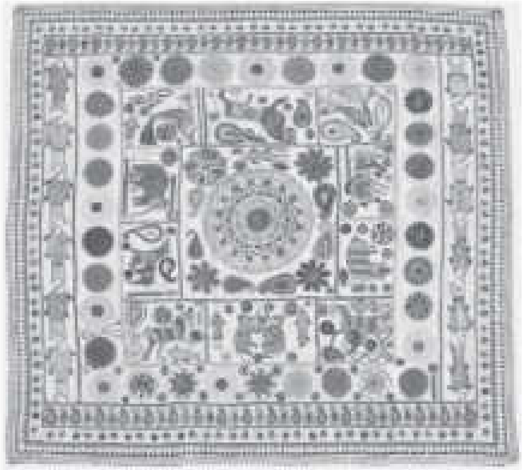

নকশিকাঁথা

বাংলাদেশ নামক অঞ্চলে প্রাতিষ্ঠানিক চারুকলার চর্চার শুরুতে (৫০–৬০–এর দশক) চারু ও কারুশিল্পীদের জন্য পেশা হিসেবে তেমন কোনো কাজ লোকজীবনে অনুভূত হতো না। দিনের পর দিন চারুশিল্পীরা ও সংস্কৃতি জগতের মানুষেরা চিত্রকলার প্রয়োজনীয়তা, কারুশিল্পের গুরুত্ব সমাজকে বোঝাতে পেরেছে। একটি উন্নত সমাজে ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, প্রশাসক, শিক্ষক, বিজ্ঞানী এমনি পেশার মানুষ যেমন প্রয়োজন, পাশাপাশি প্রয়োজন স্থপতি, চিত্রশিল্পী এবং সংস্কৃতির মানুষের। পেশাগতভাবে চারু ও কারুশিল্পীরা বর্তমানে অনেক এগিয়ে রয়েছে। প্রাথমিক শিক্ষা থেকেই চারু ও কারুকলা বিষয়টি শিক্ষাক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক পর্যায়ে চারু ও কারুকলার অনেক শিক্ষক। ৪টি প্রধান বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে রয়েছে চারুকলা বিষয়ের বিশাল আকারের অনুষদ ও বিভাগ। প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে রয়েছে চারু ও কারুকলা শিক্ষার বিভাগ। এছাড়া বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান রয়েছে চারুকলা চর্চার। নিম্নপর্যায় থেকে শিক্ষার একেবারে উচ্চপর্যায় পর্যন্ত চারু ও কারুকলায় বহু শিল্পী শিক্ষকতা পেশায় নিয়োজিত।

বাংলাদেশের চারু ও কারুশিল্পে সৃজনশীলতার প্রকাশ ঘটেছে অনেক আগে থেকেই। চিত্রশিল্পীদের আঁকা ছবির সমাদর দেশে–বিদেশে ব্যাপৃত। সমাজে শিক্ষাবোধ ও সংস্কৃতি চেতনা উত্তরোত্তর সমৃদ্ধির পথে। অনেক ব্যবসায়ী শিল্পকর্ম বিক্রি করে জীবিকা নির্বাহ করছেন। ফলে সংস্কৃতিবানরা অর্থের বিনিময়ে ছবি সংগ্রহ করছেন। কারুশিল্পও সংগ্রহ করছেন। তাদের বসবাসের আবাসে চিত্র সাজাচ্ছেন, কারুশিল্প সাজাচ্ছেন, স্থাপন করছেন ভাস্কর্য। অফিস, প্রতিষ্ঠানের চত্বরে ভাস্কর্যশিল্প প্রতিস্থাপন করে, প্রতিষ্ঠানের ভবনের দেয়ালে চারু ও কারুশিল্পীদের দিয়ে সৃজনশীল ম্যুরালশিল্প স্থাপন করে প্রতিষ্ঠানকে গুরুত্বপূর্ণ করে তুলেছেন।

বাংলাদেশের চিত্রশিল্পীরা বিজ্ঞাপনী সংস্থার জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে। টেলিভিশন মাধ্যমে শিল্পীরা অনুষ্ঠানের পটভূমিকে চমৎকার নান্দনিকতায় তুলে ধরে প্রতিটি অনুষ্ঠান আনন্দময় ও সুখকর করে তুলতে পারছে। সংবাদপত্রের জন্য চিত্রশিল্পী অবশ্যই প্রয়োজন। প্রয়োজন চলচ্চিত্রশিল্পে। বাণিজ্যিক ও শিল্পমেলায় শিল্পীরা চমৎকার আকার–আকৃতি ও নকশায় প্যাভিলিয়ন, গেট স্টল তৈরি ও অভ্যন্তরীণ সাজসজ্জা করে যাচ্ছেন। বাড়ি, অফিস, দোকান, সুপার মার্কেটের অভ্যন্তরীণ নকশা, সাজসজ্জা চারু ও কারুশিল্পীরা নিপুণভাবে সমাধা করছে।

তাই নির্দ্বিধায় বলা যায় চারু ও কারুশিল্পের প্রয়োজনীয়তা, বিস্তৃতি ও প্রসার ঘটার কারণে পেশা হিসেবে শিল্পীর গুরুত্ব সমাজে তথা দেশে ক্রমে সমৃদ্ধির পথেই এগুচ্ছে। নিঃসংকোচে তরুণ প্রজন্ম চারু ও কারুকলাকে পেশা হিসেবে আনন্দ ও উৎসাহের সঙ্গে গ্রহণ করছে।

পাঠ : ১১, ১২, ১৩ ও ১৪

লোকজীবনে সম্পৃক্ত বিভিন্ন শিল্পকর্ম

লোকজীবনে সম্পৃক্ত বিভিন্ন শিল্পকর্ম সম্পর্কে পূর্বের বিভিন্ন আলোচনায় প্রায় সর্বত্র বলা হয়েছে। শিল্পকর্মগুলোকে আমরা কয়েকটি ভাগে ভাগ করে নিলে বিষয়টি বুঝতে সহজ হবে।

১. লোকশিল্প : পোড়ামাটির ছোটো-বড়ো পুতুল, পোড়ামাটির ফলকচিত্র, কাঠের তৈরি হাতি, ঘোড়া, মানুষ, পাখি, নকশিকাঁথা, সরাচিত্র, মাটির রঙিন পুতুল, মাটির খেলনা, শীতলপাটি, শখের হাঁড়ি, গাজীর চিত্র, গাজীরপট ইত্যাদি।

২. কারুশিল্প : দা, কুড়াল, কোদাল, পোড়ামাটির হাঁড়ি, পাতিল, শানকি, বাটি, মাটির তৈরি ব্যাংক, মটকা ইত্যাদি। বাঁশের তৈরি টুকরি, খাঁচা, ঝাঁকা, ছোটো-বড়ো বাঁশি, হুকো, মাছ ধরার চাই, মাথাল, ঘরবাড়ির জন্য নানারকম নকশা ইত্যাদি। কাঁসার থালা, ঘটি, পিতলের কলসি ইত্যাদি। সোনা, রুপার অলংকার, তামার পাত্র। বাংলাদেশের কাঠের কারুশিল্প বেশ সমৃদ্ধ। ঘরের দরজা-জানালার কপাট, খাট, পালং ও আলমারির গায়ে ফুল-পাখির ছবি, লতাপাতা এমনকি লোকজীবনের দৃশ্য নিপুণভাবে কাঠ খোদাই করে রসিক শিল্পকর্মগুলো উন্নতমানের কারুশিল্প। বাংলাদেশের নদীতে ও সমুদ্রে চলাচলের ছোটো-বড়ো নানা অবয়বের নৌকা বাংলার কারুশিল্পীরা করে থাকেন।

বাঁশ ও বেতের আসবাবপত্র, সোফা, চেয়ার, টেবিল, মোড়া উন্নতমানের কারুশিল্প।

বাঁশ, কাঠ, লোহা, টিনের পাত ও প্লাস্টিকের সমন্বয়ে তৈরি হয় যানবাহন রিকশা। রিকশার কারুকাজ সৌন্দর্যসৃষ্টি ও নান্দনিক রূপের জন্য দেশে-বিদেশে নন্দিত। জাপান, ব্রিটেন, আমেরিকা ও কানাডায় রিকশার কারুকাজের প্রদর্শনী হয়েছে। রিকশার পেছনে শিল্পীরা যে ছবি আঁকেন সেই চিত্রকলাও আন্তর্জাতিকভাবে প্রশংসা অর্জন করেছে।

লোকজীবনের সঙ্গে সম্পৃক্ত আধুনিক চিত্রকলা, নকশা, পোশাকশিল্প, সিরামিকশিল্প, ইন্টেরিয়র ডিজাইন, ভাস্কর্য, ম্যুরাল এবং স্থাপনা শিল্প।

বিভিন্ন রকমের কারুশিল্প

বাংলাদেশের চিত্রশিল্পীদের অনেক প্রদর্শনী হচ্ছে। ভাস্কর্যের ও আধুনিক কারুকলার প্রদর্শনী হচ্ছে। সংস্কৃতিবান রুচিশীল মানুষ ও শিল্পের সমঝদার মানুষের সংখ্যাও দিন দিন বেড়ে চলেছে। তাঁরা শিল্পকলা–তথা চিত্রকলা, ভাস্কর্য ও অন্যান্য শিল্পকলা অর্থের বিনিময়েই সংগ্রহ করছেন। নিজেদের বাড়ি, ঘর, অফিস, ব্যবসা প্রতিষ্ঠান সাজাচ্ছেন। শিল্পকলা তাঁদের জীবনে আনন্দ বয়ে আনছে।

বাংলাদেশে বিভিন্ন পশুর চামড়া দিয়েও নানারকম কারুশিল্পের কাজ হচ্ছে। চামড়ার ব্যাগ, জুতা ও পোশাকের দেশে যেমন কদর বিদেশেও তেমনি।

নমুনা প্রশ্ন

বহু নির্বাচনি প্রশ্ন

১। বাংলাদেশে লোকশিল্প হলো–

ক. নকশিকাঁথা, শখের হাঁড়ি
খ. তামা–কাঁসার তৈজসপত্র
গ. বাঁশ ও বেতের ঝুড়ি
ঘ. উপরের সবগুলো

২। বৌদ্ধদের প্রধান উৎসব কোনটি?

ক. বড়োদিন
খ. বুদ্ধপূর্ণিমা
গ. দুর্গাপূজা
ঘ. ঈদ

৩। টেপা পুতুল কীসের তৈরি?

ক. মাটির
খ. প্লাস্টিকের
গ. লোহার
ঘ. কাঠের

৪। জুম চাষ কোথায় করা হয়?

ক. নদীর তীরে
খ. সমতল ভূমিতে
গ. পাহাড়ের ঢালে
ঘ. সমুদ্রের তীরে

৫। মঙ্গল শোভাযাত্রা আয়োজন করে–

ক. চারুকলা অনুষদ
খ. বাংলা একাডেমি
গ. শিল্পকলা একাডেমি
ঘ. শিশু একাডেমি

২০২৫

লিখে জবাব দাও

১. বাঙালি লোকজীবনে চারু ও কারুকলা– শহরে বিষয়টি কীভাবে দেখা হয়? বর্ণনা দাও।

২. গ্রামীণজীবনে চারু ও কারুকলার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও।

৩. লোকায়ত বাংলার চারু ও কারুকলার অবস্থান ও ব্যবহার নিয়ে সংক্ষেপে লেখো।

৪. বাংলাদেশে ১লা বৈশাখ–বাংলা নববর্ষ উদ্‌যাপনের একটি সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দাও।

৫. সংক্ষেপে জবাব লেখো।

ক. গ্রামের বৈশাখী মেলা।

খ. ছায়ানটের ১লা বৈশাখ উদ্‌যাপন।

গ. চারুকলা অনুষদে মঙ্গল শোভাযাত্রা ও মেলা।

ঘ. চারুকলার শিল্পীরা কোন কোন পেশায় কাজ করে চলেছে।

ঙ. লোকশিল্পী ও লোকশিল্প।

চ. বাঁশ, বেত ও কাঠের কারুশিল্প।

ছ. সমাজে একজন চিত্রশিল্পীর গুরুত্ব।

৬. সংক্ষিপ্ত টীকা লেখো।
কামার, কুমার, নকশিকাঁথা, নৌকাবাইচ, আলপনা, একুশে ফেব্রুয়ারি, রিকশা, কাঠে খোদাই করা শিল্পকর্ম, পাটের শিল্প, হাতপাখা।

চতুর্থ অধ্যায়

আঁকতে হলে জানতে হবে

শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিনের আঁকা মুক্তিযোদ্ধা

এ অধ্যায় পড়া শেষ করলে আমরা–

- ছবি আঁকার নিয়মগুলো ব্যাখ্যা করতে পারব।
- ছবি আঁকার বিভিন্ন উপকরণের বর্ণনা দিতে পারব।
- ছবি আঁকার বিভিন্ন মাধ্যম ও তার ব্যবহার সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারব।

পাঠ : ১

ছবি আঁকার নিয়ম

ষষ্ঠ শ্রেণিতে আমরা ছবি আঁকার সাধারণ নিয়মগুলো সম্পর্কে জেনেছি। আমরা জেনেছি যে, ছবি আঁকতে হলে বস্তু বা বিষয়ের আকৃতি, গড়ন, অনুপাত ইত্যাদি খেয়াল করে প্রথমে ড্রইং করে নিতে হয়। পৃথিবীর যাবতীয় বস্তুকেই তিনটি আকৃতিতে ফেলা যায়। সেগুলো হচ্ছে বৃত্ত, ত্রিভুজ এবং চতুর্ভুজ। কোনটি কোন আকৃতিতে পড়বে তা ভালোভাবে বুঝে নিয়ে আকৃতি ঠিক করতে হয়। এ অধ্যায়ে আমরা ড্রইং করার পদ্ধতি, আকার-আকৃতি, অনুপাত ও পরিপ্রেক্ষিত সম্পর্কে জানব। সেই সঙ্গে ছবিতে কম্পোজিশন ও আলোছায়ার গুরুত্ব ও এর সঠিক প্রয়োগ বিষয়েও জানব।

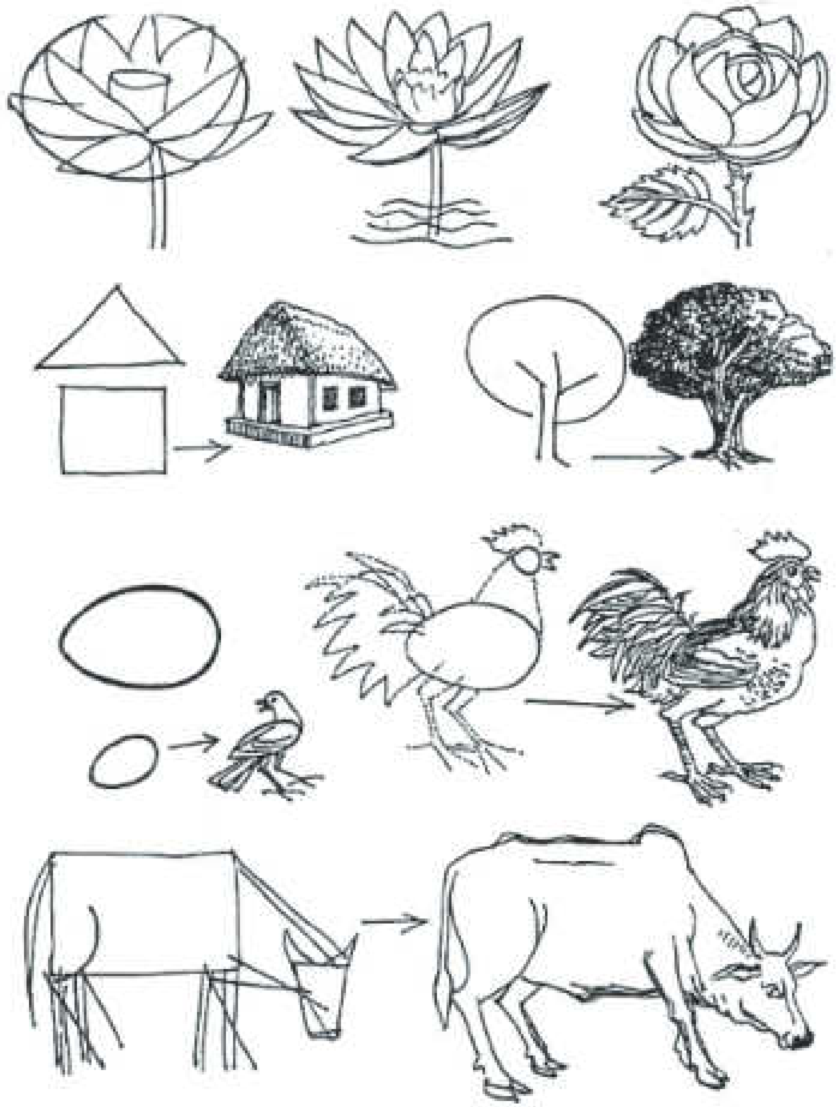

আকার-আকৃতি, বস্তুর রূপ ও আসল কেমন, গোলাকার, চারকোনা বা তিনকোনা? ভালো করে দেখে তারপর আঁকতে হয়।

২০১৮

ড্রইং

কোনো বস্তু বা বিষয়ের ছবিকে শুধু রেখা দিয়ে কাগজে বা ক্যানভাসে আঁকাকে ড্রইং বলে। এই ড্রইং পেনসিলে, কলমে, কাঠ-কয়লায় বা তুলি দিয়ে করা হয়। বাস্তবে কোনো বস্তুর, জীবজন্তুর ও গাছপালার গায়ে কোনো রেখা নেই। যে রেখা আমরা আঁকি–ড্রইং করার জন্য তা হলো–মনে করো একটি কলসি। কলসিটি গোল–এর একটা আকার ও আয়তন আছে। কলসি বেশ খানিকটা জায়গা দখল করে অবস্থান করে। আমরা এই কলসিকে কাগজের সমতলভূমিতে কয়েকটি রেখা দিয়ে ফুটিয়ে তুলি। এই রেখা হলো আমাদের দৃষ্টির সীমারেখা। কলসিটি সামনের দিকে অনেকখানি দেখার পর আর আমরা দেখি না। দৃষ্টি যেখানে আটকে যায় সেখানেই রেখাকে অনুমান করে নিই। এভাবে পাহাড়, নদীনালা, গাছপালা, জীবজন্তু, দালানকোঠা সবকিছুই আমরা এমনভাবে দেখতে অভ্যস্ত বা আমাদের চোখ এভাবেই দেখতে বাধ্য করে। দৃষ্টি যেখানে আটকে যায় সেখানে কাল্পনিক রেখা দিয়ে কাগজের সমতলভূমিতে সবকিছুই ফুটিয়ে তুলি। এই ছবিকে আরও নিখুঁত ও সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তোলা হয় আলোছায়াকে ঠিকভাবে এঁকে।

রং, আলোছায়া বা শুধু রেখা দিয়ে কাগজের সমতলভূমিতে ছবি আঁকা হলেও বিষয়গুলোর ওজন, আয়তন ও আকার বুঝতে কষ্ট হয় না। অর্থাৎ কলসি যে গোল, এর ওজন আছে এবং খানিকটা জায়গা দখল করে থাকে, এসব সমতল কাগজে রেখা দিয়ে আঁকা হলেও বুঝতে কষ্ট হয় না। তাই নিখুঁত ছবি ফুটিয়ে তোলার জন্য ছবি আঁকার কয়েকটি অপরিহার্য বিষয় ও নিয়ম সম্পর্কে সচেতন হতে হয়। সেগুলো হলো–

১। আকার ও আকৃতি

২। অনুপাত

৩। পরিপ্রেক্ষিত

৪। কম্পোজিশন

৫। আলোছায়া

৬। রং

১। **আকার ও আকৃতি** : আমাদের চারপাশে যেসব জিনিস রয়েছে– গাছপালা, জীবজন্তু সবকিছুরই নিজস্ব আকার ও আকৃতি রয়েছে। কোনোটা গোলাকার, কোনোটা লম্বাটে, কোনোটা চারকোণা বা তিনকোণা ইত্যাদি। একটু ভালো করে লক্ষ করে দেখবে প্রায় সব জিনিসই উপরে উল্লিখিত আকৃতির মধ্যে পড়ে। যেমন- ফুল, ফল, গাছ এসব গোলাকার। ঘর, বাড়ি, নৌকা ইত্যাদি চতুর্ভুজ ও ত্রিভুজের আকারে ফেলা যায়। পাখি প্রায় সবই ডিম্বাকৃতি (গোলাকারের ভিন্নরূপ)।

ছবিতে 'অনুপাত' ঠিকমতো ফুটিয়ে তুলতে না পারলে ওপরের ছবির মতো অবস্থা হয়

২। **অনুপাত** : ছবি আঁকার বিষয়ে 'অনুপাত' একটি অতি জরুরি বিষয়। অনুপাত ছাড়া ছবি নিখুঁত হয় না। যেমন— একটি কলস শরীরের তুলনায় কলসের মুখ ও ঘাড়ের একটা নির্দিষ্ট মাপ আছে। শরীরের তুলনায় মুখ ও ঘাড় কতটুকু ছোটো-বড়ো হবে তা ভালোভাবে দেখে ঠিক করে নিতে হবে। একজন মানুষের শরীরের তুলনায় তার হাত, পা, চোখ, কান ইত্যাদি কী মাপের হবে তা সুনির্দিষ্ট করে আঁকতে হবে। আবার একটি প্রাকৃতিক দৃশ্যের ছবিতে— অনেক গাছপালা, জীবজন্তু ও জিনিসপত্র থাকে। তাদের প্রত্যেকেরই একটি নিজস্ব বিশেষ আকৃতি ও মাপ রয়েছে। তুলনামূলকভাবে কোনটি বড়ো হবে, কোনটি ছোটো হবে তা ভালোভাবে লক্ষ করে ছবিতে সাজাতে হবে।

পাঠ : ২ ও ৩

৩। **পরিপ্রেক্ষিত** : বাস্তববাদী ছবি আঁকার জন্য পরিপ্রেক্ষিত প্রয়োজন। পরিপ্রেক্ষিত ঠিকমতো ছবিতে উপস্থাপন করতে না পারলে বা ফুটিয়ে তুলতে না পারলে সে ছবি সত্যিকারের বাস্তব ছবি হয়ে ওঠে না। আমাদের চোখ, সে চোখে দেখা, দেখার নানারকম ভঙ্গি, এ সবের উপরই পরিপ্রেক্ষিত নির্ভর করে। যেমন— একটি কাচের গ্লাস মেঝেতে রেখে তুমি তা দেখছ। তুমি একটি নির্দিষ্ট স্থানে দাঁড়িয়ে থেকে কাচের গ্লাসটি ধীরে ধীরে কয়েকটি পর্যায়ে উপরের দিকে তুলে ভালো করে দেখো। যখন যেমন— দেখছ, প্রত্যেকটি পর্যায়ের অবস্থানের হুবহু ছবি আঁকো। এক পর্যায়ে গ্লাসের উপরিভাগে তোমার চোখের সমান্তরালে অবস্থান করে ছবি আঁকো। এবার গ্লাসের সবগুলো অবস্থানের ছবি মিলিয়ে দেখো। তোমার দেখার ভঙ্গির জন্য একই গ্লাসের কত রকম রূপ হয়েছে।

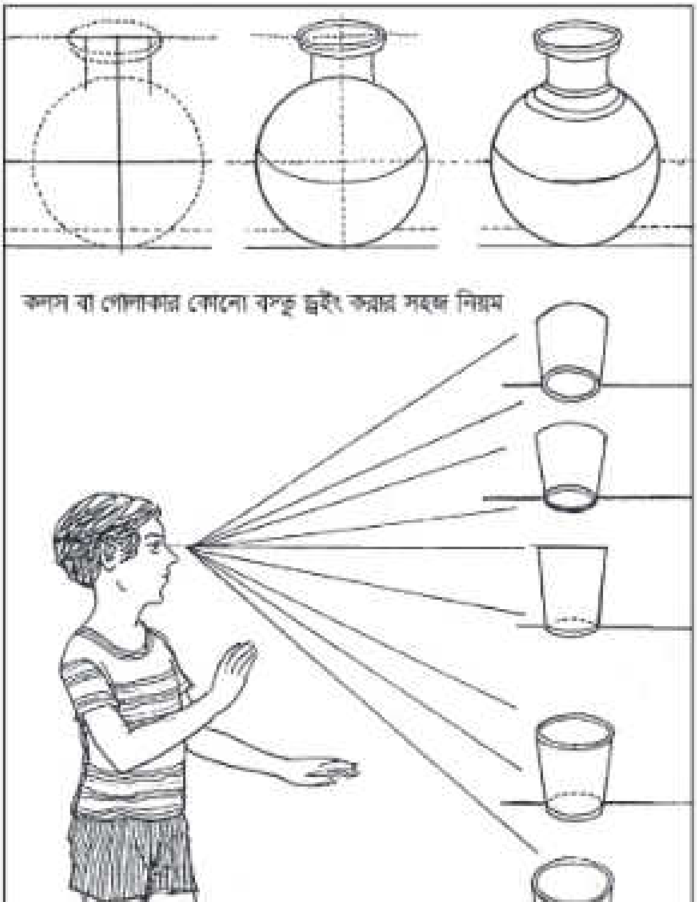

পরিপ্রেক্ষিত বা পারসপেকটিভ।
চোখের সমান্তরালে আমরা কোনো বস্তু যেভাবে দেখি।

একটি নির্দিষ্ট জায়গায় বসে তোমার পড়ার টেবিলে একটি বই রেখে ভালোভাবে দেখো— বইয়ের অবস্থান কীভাবে রয়েছে। এবার দেখে দেখে বইটির ছবি আঁকো। একই বইকে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বিভিন্ন অবস্থানে রেখে আঁকো। এবার সবগুলো ছবি মিলিয়ে দেখো একই বইয়ের কত রকম রূপ হয়।

আগের বইটির সমান আকারে আরও দুটো বই সামনে-পেছনে করে সাজিয়ে একই নির্দিষ্ট স্থান থেকে ভালোভাবে

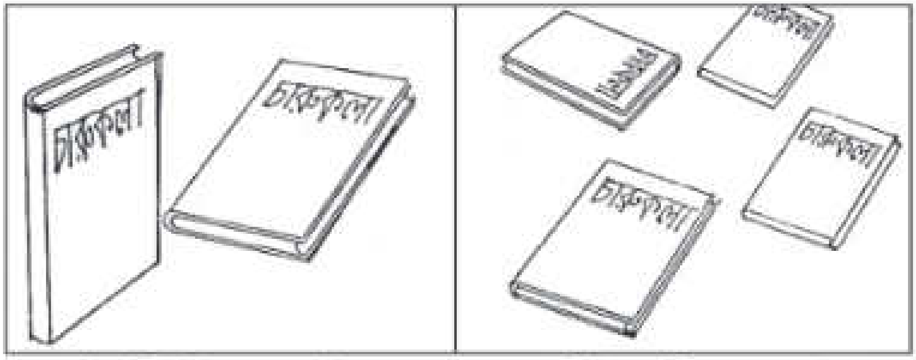

একই বই ভিন্ন ভিন্ন অবস্থানে ভিন্ন চেহারা।

একই মাপের বই দূরত্ব ও অবস্থানের কারণে ছোটো-বড়ো হয়ে যাচ্ছে।

লক্ষ করো। সামনের বই যত বড়ো মনে হবে, পরেরটি মনে হবে আরও ছোটো। আর দূরে যে বই সেটি মনে হবে আরও ছোটো। অর্থাৎ যতই দূরে যাচ্ছে ক্রমশ ছোটো হয়ে যাচ্ছে। এই একই মাপের বই অথচ এটা কেন হচ্ছে? কারণ আমরা এভাবেই দেখতে অভ্যস্ত। চোখ আমাদেরকে এভাবেই দেখতে বাধ্য করে।

তোমার ঘরের জানালা দিয়ে বাইরে তাকাও। খেলার মাঠ, বাজার, গাছপালা, রাস্তা, মানুষ–এমনি অনেক কিছুই একসঙ্গে চোখে পড়বে। অথচ জানালার মাপ কত? বড়োজোড় চার ফুট লম্বা ও তিন ফুট চওড়া।

রেললাইন ভালো করে লক্ষ করে দেখো। কাঠের স্লিপারের উপর দিয়ে লোহার দুটো লাইন দূরদূরান্ত পর্যন্ত চলে গিয়েছে। লাইন দুটো পাশাপাশি সমান দূরত্বে রেখে বসানো হয়েছে। কোথাও এক ইঞ্চি এদিক–সেদিক হওয়ার উপায় নেই। আর সামান্যতম ব্যতিক্রম হলে ট্রেন চলবেই না। এমনি এক রেললাইনে দাঁড়িয়ে তুমি সামনের দিকে তাকাও।

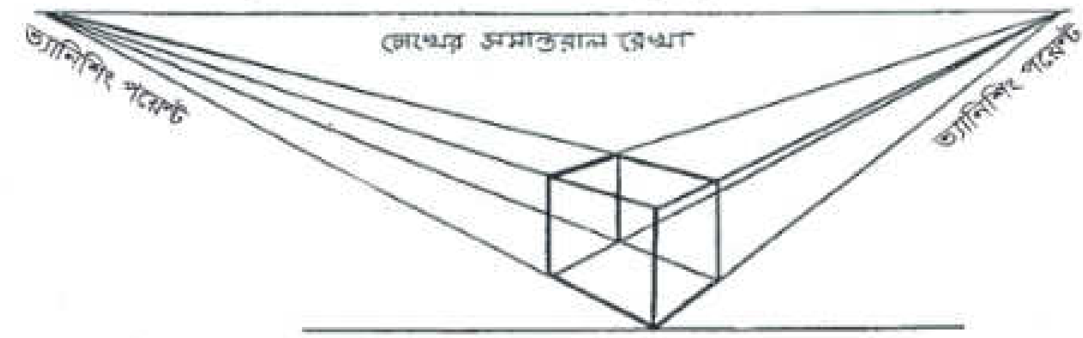

সবদিকে সমান এই চারকোণা বাক্স এঁকে পরিপ্রেক্ষিত বোঝানো হয়েছে

রেললাইন সোজা পথে যেখানে অনেক দূর চলে গিয়েছে সেরকম জায়গা দেখে দাঁড়াবে। যেখানে রেললাইন বাঁকে ঘুরেছে– সেখানে নয়। দেখবে পাশাপাশি লোহার লাইন দুটো ধীরে ধীরে এক বিন্দুতে গিয়ে শেষ হয়েছে। রেললাইনের পাশে যে টেলিগ্রাফের তারের থামগুলো পরপর রয়েছে সেগুলোও একই সমান্তরাল রেখায় একই বিন্দুতে এসে মিশে যাবে। মাথার উপরে আকাশ ও মাঠ–ঘাট, গাছপালা সবই দেখবে তোমার চোখের সমান্তরাল রেখায় আগের সেই বিন্দুতে এসে মিশে যাচ্ছে। অর্থাৎ তোমার দেখার সীমানা এই বিন্দুতে শেষ হয়েছে– যে বিন্দু তোমার চোখের সমান্তরাল রেখায়। এই বিন্দুকে ইংরেজিতে বলে 'ভ্যানিশিং পয়েন্ট'। চোখের সমান্তরাল রেখাকে বলে 'হরাইজন লাইন'। বাংলায় বলা যায় 'দিগন্ত রেখা'। দিগন্ত রেখা খোলা মাঠে বা বড়ো নদী ও সাগর তীরে দাঁড়ালে আরও পরিষ্কার বুঝবে।

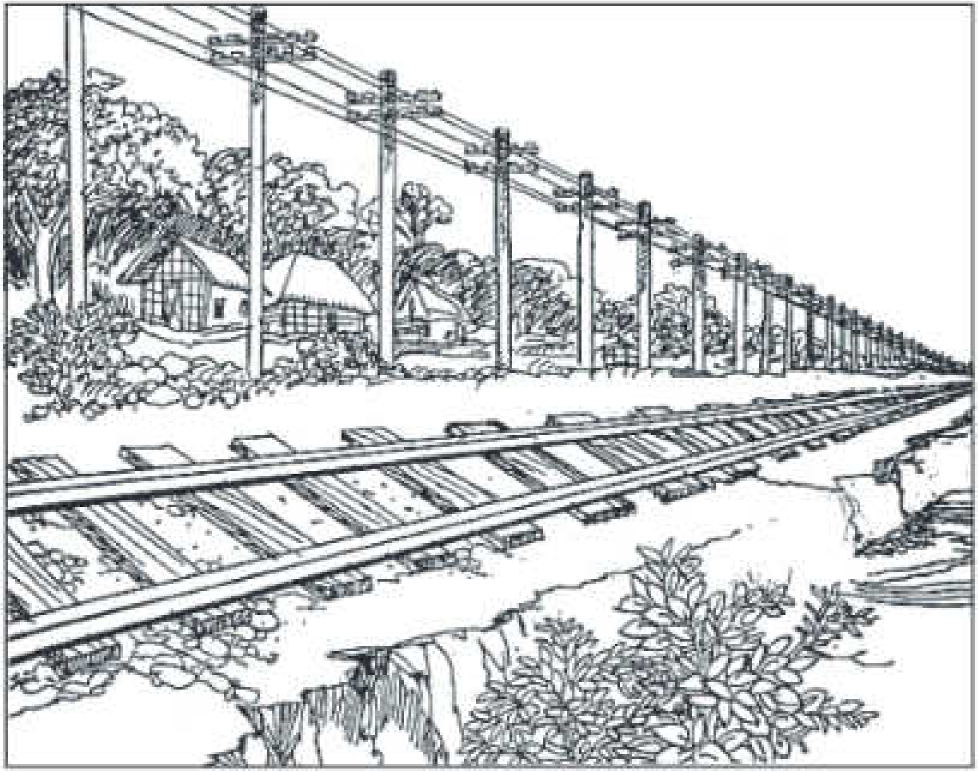

রেল লাইনের কাছে দাঁড়িয়ে দেখলে পরিপ্রেক্ষিত বিষয়টি ভালোভাবে বোঝা যায়।

পরিপ্রেক্ষিত শুধু আকার আকৃতির ছোটো-বড়ো, সামনে–পিছনে ও দূরত্ব বোঝানো জন্য যেমন প্রয়োজন তেমনি রং ও আলোছায়ার ক্ষেত্রেও আবশ্যক। ছবিতে সামনের দিকে রং যত উজ্জ্বল ও প্রখর হবে; যতই দূরে যাবে রং ধীরে ধীরে ম্লান হয়ে যাবে। যেমন–সামনের গাছের পাতা যত সবুজ হবে, রোদ ও আলোছায়ার প্রকাশ যতখানি প্রখর হবে, একশ গজ দূরে একই ধরনের গাছ আকারে যেমন ছোটো হয়ে যাবে তেমনি সবুজ রং অনেক হালকা ও নীলের আভা মেশানো হবে। আলোছায়া ও রোদের প্রখরতাও অনেক কমে আসবে। রং কতটুকু ম্লান হবে বা হালকা হবে তা সঠিকভাবে ছবিতে ফুটিয়ে তোলাই হলো পরিপ্রেক্ষিত। ছবিতে পরিপ্রেক্ষিত ঠিক হলেই দুই গাছের দূরত্ব যে একশ গজ তা সহজেই ফুটে উঠবে। পরিপ্রেক্ষিত ঠিকমতো প্রকাশ করতে না পারলে ছবি প্রাণহীন হয়ে পড়ে।

পাঠ : ৪

কম্পোজিশন

কম্পোজিশন ইংরেজি শব্দ। বাংলা অর্থ–রচনা। মনে করো গরু নিয়ে রচনা লেখা হবে। গরুর সবরকম পরিচয় যাতে সঠিকভাবে প্রকাশ পায়, সেভাবে ভাষা দিয়ে তুমি রচনা তৈরি করলে। ছবির ক্ষেত্রেও 'রচনা' বা কম্পোজিশন অনেকটাই তাই। মনে কর, এই গরুর ছবি আঁকতে গিয়ে কম্পোজিশন— তোমার কাগজের আকার অনুযায়ী গরু কত বড়ো করবে–গরুকে কাগজের ঠিক মাঝখানে রাখবে না ডান পাশে বা বাম পাশে উপরের দিকে বা নিচের দিকে অর্থাৎ কত বড়ো

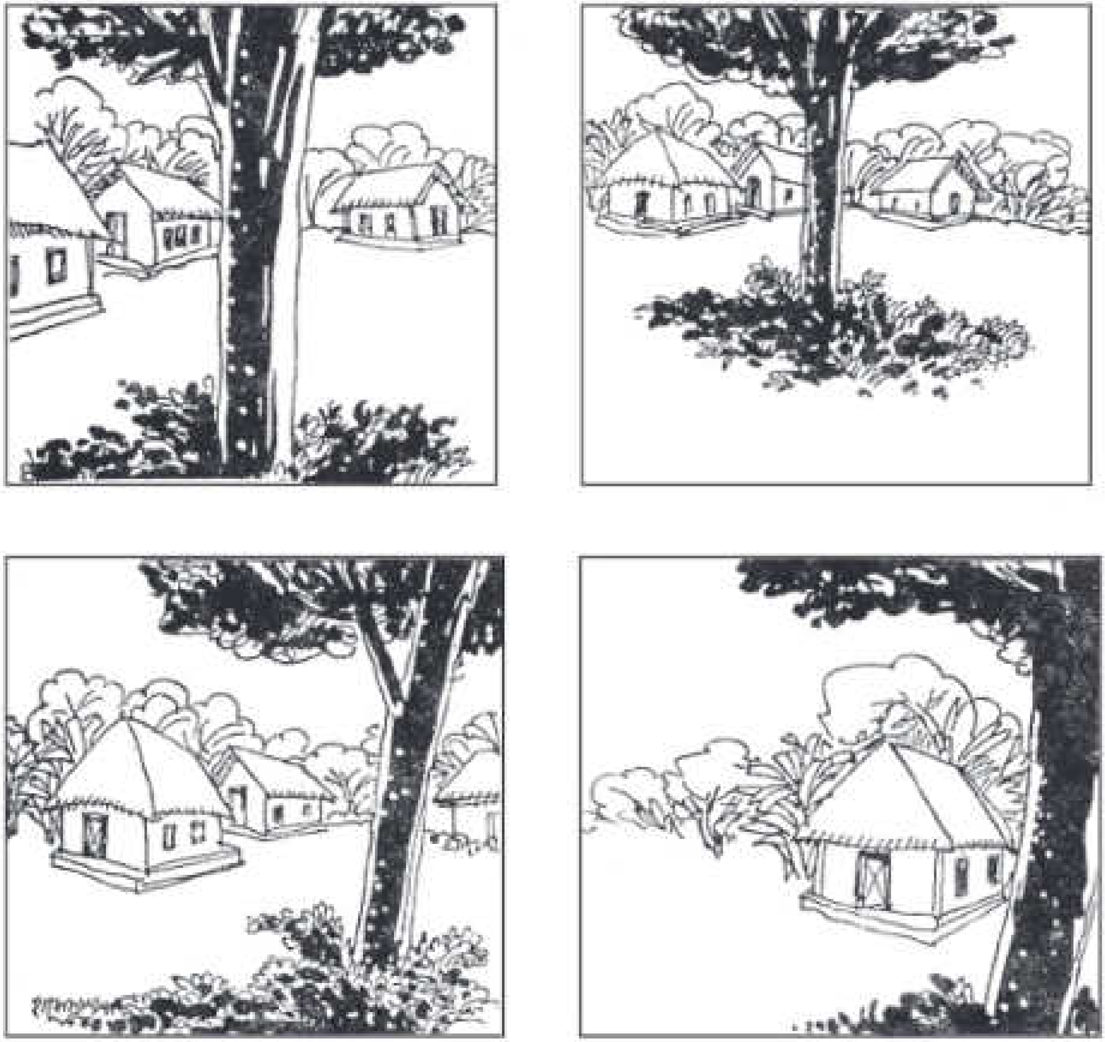

কম্পোজিশন, একই বিষয়বস্তু— ভিন্ন ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে চার রকমভাবে সাজানো হয়েছে। যেটি ভালো ও সুন্দর সেটিই আঁকতে হবে।

করে আঁকলে ও কাগজের কতটুকু জায়গা নিয়ে পুরো ছবিটা সাজালে ছবি দেখতে সুন্দর হবে তা ঠিকমতো করাই হলো ছবির কম্পোজিশন। ছবির কম্পোজিশন ঠিক করার সময় ছবির বিষয়ে যেসব মানুষ, জীবজন্তু বা অন্যান্য জিনিস থাকে তার আকার–আকৃতি, রং, আলোছায়া এসব মনে রেখে বিষয়টি যাতে সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তোলা যায় সেইভাবে সাজাতে হবে এবং ভালোভাবে চিন্তাভাবনা করে ঠিক করে নিতে হবে। তাই, যে বিষয়ে ছবি আঁকা হবে তার জন্য অন্তত তিন রকম বা চার রকম কম্পোজিশন ছোট কাগজে এঁকে সবগুলো পাশাপাশি রেখে ঠিক করতে হয় কোনটি আঁকলে বেশি সুন্দর হবে। সবদিক বিবেচনা করে যে কম্পোজিশনটি ভালো হবে বলে মনে হয় সেটিই বড়ো করে মূল ছবি আঁকতে হবে।

পাঠ : ৫

আলোছায়া

ছবি আঁকায় আলোছায়া একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক। ছবিতে আলোছায়াকে সঠিকভাবে রূপ দিতে না পারলে অর্থহীন হয়ে পড়ে। আকর্ষণীয় হয় না। আমরা জানি সূর্য পূর্ব দিকে ওঠে, পশ্চিম দিকে অস্ত যায়। সুতরাং প্রাকৃতিক দৃশ্য আঁকার সময় লক্ষ রাখতে হবে সূর্যের অবস্থান আকাশে কোন জায়গায়। যে দৃশ্য আঁকা হবে তাতে রোদ কেমনভাবে পড়ছে। দৃশ্যে গাছপালা, জীবজন্তু ও অন্যান্য জিনিসের উপর রোদের অবস্থান এবং তাদের ছায়া মাটিতে কীভাবে পড়েছে তা ভালোভাবে লক্ষ করতে হবে। ঘরের ভেতরে ও ছায়ায় যেসব বিষয়ের ছবি তাতেও আলোছায়া থাকে। কোনো স্থির জীবন, মানুষ বা ফুলদানিসহ ফুল, এ ধরনের বিষয় ঘরে বসে আঁকা হয়। দরজা-জানালা বা অন্য কোনোভাবে আলো এসে এদের উপর পড়বে। আলো কীভাবে এসে পড়ছে- তারপর ধীরে ধীরে হালকা থেকে গাঢ় হয়ে ছায়া পড়ে।

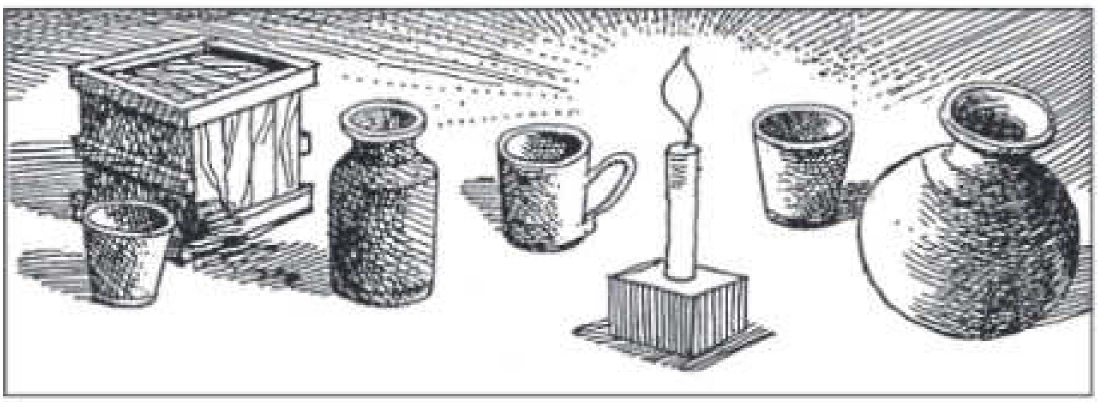

ছবিতে 'আলোছায়া' যথাযথভাবে আঁকতে হবে। ওপরের ছবিতে রোদ ও ছায়া কীভাবে পড়েছে তা দেখানো হয়েছে। নিচের ছবিতে মোমবাতির আলোর প্রতিফলন ও বিভিন্ন 'ছায়ার' রূপ।

আলোছায়ার যে তারতম্য ঘটে তা বিশদভাবে খেয়াল রেখে আঁকতে হয়। ছবিতে আলোছায়াকে মোটামুটি তিনভাগে ভাগ করা যায়।

১। খুব বেশি আলো

২। মাঝামাঝি আলো ও ছায়া

৩। হালকা ছায়া ও গাঢ় ছায়া

রঙের জন্য আলোছায়াতেও তারতম্য ঘটে। একই ছবিতে পাশাপাশি যদি লাল, নীল, সাদা ও কালো রঙের কিছু জিনিস থাকে এবং তাতে যে আলো ও ছায়া পড়ে তা বিভিন্ন রং হওয়াতে তারতম্য ঘটে বা নানারকম আলোছায়া হয়। প্রতিটি রঙের আলোছায়ার এ তারতম্য ভালোভাবে লক্ষ করে সঠিকভাবে আঁকতে হয়। পূর্বের পৃষ্ঠায় আলোছায়ার কিছু উদাহরণ দেওয়া আছে। ভালো করে লক্ষ করলে বিষয়টি বুঝতে সহজ হবে।

রং : ছবির প্রাণ বলতে বোঝায় রং। যে বিষয়ে ছবি আঁকা হবে তার রং খুব ভালোভাবে লক্ষ করে তারপর আঁকতে হয়। লাল রং হলে লাল লাগিয়ে দিলেই হয় না। আলোছায়ার জন্য এবং আশপাশের অন্যান্য রঙের আভায় নানান প্রতিফলনে রঙের অনেক পরিবর্তন ঘটে। এ পরিবর্তন ও তারতম্য ভালোভাবে বুঝে নিয়ে লাল রং লাগাতে হবে। আমরা কথায় কথায় বলি আমাদের প্রকৃতি বা গাছপালা সবুজ, উজ্জ্বল সবুজ, হলুদ আভাযুক্ত সবুজ, লাল, নীল মেশানো সবুজ, সবুজের মাঝে আছে আরও নানা রকম রং। সুতরাং গাছ এঁকে সবুজ লাগালেই ঠিক রং করা হলো না। যে ধরনের সবুজ সেই সবুজই লাগাতে হবে। তা না হলে ছবি প্রাণহীন মনে হবে। রঙের ব্যবহার সম্পর্কে সচেতন হতে হবে। ছবি আঁকার জন্য কোন কোন রং ব্যবহার করা যায় তার পরিচিতি আগেই দেওয়া হয়েছে। যে রং দিয়ে ছবি আঁকা হবে সে রঙের ব্যবহার–নিয়ম কয়েকদিন অভ্যাস করে রপ্ত করে নিতে হয়। রঙের ব্যবহার যথাযথ না হলে ছবি নষ্ট হওয়ার অনেক সম্ভাবনা থাকে।

পাঠ : ৬

কাপড়, কাগজের ছবি এবং কাঠ ও ফেলনা জিনিসের ভাস্কর্য

রং–তুলি দিয়ে ছবি না এঁকেও ছবি তৈরি করা যায়। যারা রং ও তুলি জোগাড় করতে পারছ না–দুঃখ করার কিছু নেই। এক রঙা কাগজ–হলুদ, নীল, লাল, সবুজ প্রভৃতি রঙের কাগজ বাজারে কিনতে পাওয়া যায়। দেশি–বিদেশি পুরোনো পত্রপত্রিকা সংগ্রহ করে নাও। এই রঙিন কাগজ ও পত্রপত্রিকার কাগজ কেটে–ছিঁড়ে অন্য একটি কাগজে আঠা দিয়ে লাগিয়ে যার যার ইচ্ছেমতো ছবি সহজেই তৈরি করা যায়। যে কাগজে ছবি তৈরি করবে–সে কাগজটি একটু মোটা হলে ভালো হয়। এভাবে ছবি তৈরি করার জন্য একটা ছোটো কাঁচি, ব্লেড, আঠা ও কিছু

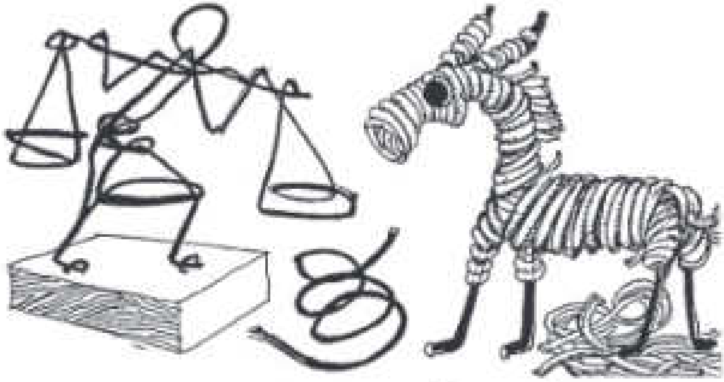

লোহার তার ও খড় পেঁচিয়ে ভাস্কর্য

রঙিন কাগজ প্রয়োজন। তা হলেই যে কেউ ছবি তৈরি করতে পারবে। একইভাবে রঙিন টুকরো কাপড় দিয়েও ছবি তৈরি করা সম্ভব। টুকরো কাপড় জোগাড় করা মোটেই কঠিন নয়। দর্জির দোকানে গেলে প্রচুর কাপড় সংগ্রহ করতে পারবে।

ফেলনা জিনিস, কাগজ, কাঠ, কাপড়, চীনামাটির হাঁড়ি-পাতিলের ভাঙা টুকরা ইত্যাদি দিয়ে অনেক রকমের ছবি ও ভাস্কর্য করা যায়।

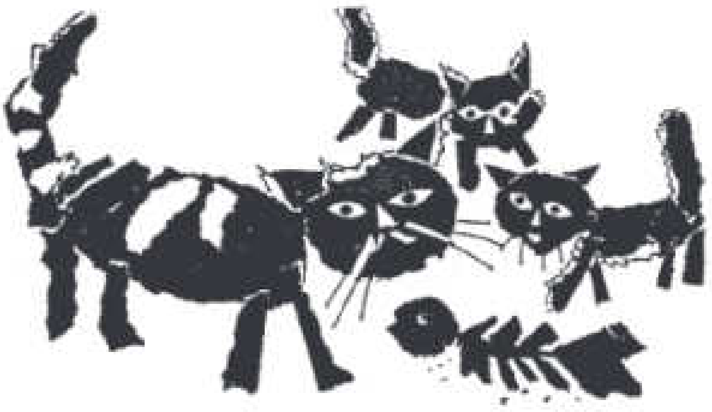

কোলাজ ছবি। কাগজ ছিঁড়ে ও কেটে ছবি।
এভাবে রং-বেরঙের কাপড় ছিঁড়ে ও কেটে কোলাজ ছবি করা হয়।

কাগজ কেটে ছবি করো বা টুকরো কাপড় দিয়েই ছবি বানাও-যে ছবি বানাবে তা পেনসিলে হালকা রেখা দিয়ে মোটা কাগজটিতে ড্রইং করে নিলে ছবি তৈরি করতে সুবিধা হয়। কাটা কাপড় ও কাগজ সাঁটা ছবিতে প্রয়োজনমতো রং দিয়ে এঁকেও ছবি করতে পার। অনেক বড়ো বড়ো শিল্পী কাগজ, কাপড় সেঁটে ও কিছু এঁকে এরকম ছবি তৈরি করেছেন। এ ধরনের ছবিকে বলা হয় 'কোলাজ' ছবি।

কাঠের টুকরা : ছোটো-বড়ো নানা আকৃতির কাঠের টুকরা পাওয়া যেতে পারে। কাঠমিস্ত্রিরা যেখানে কাজ করে সেখানেই অনেক টুকরা কাঠ মিলে যাবে। এসব কাঠের টুকরা একটির সাথে আরেকটি জোড়া লাগিয়ে নানা রকমভাবে সাজিয়ে দেখো ছোটো ভাস্কর্য তৈরি হয়ে যাবে। কখনো কখনো হাতি, ঘোড়া বা মানুষের আকৃতি দেয়া যায় এভাবে। ছবির উদাহরণগুলো দেখো।

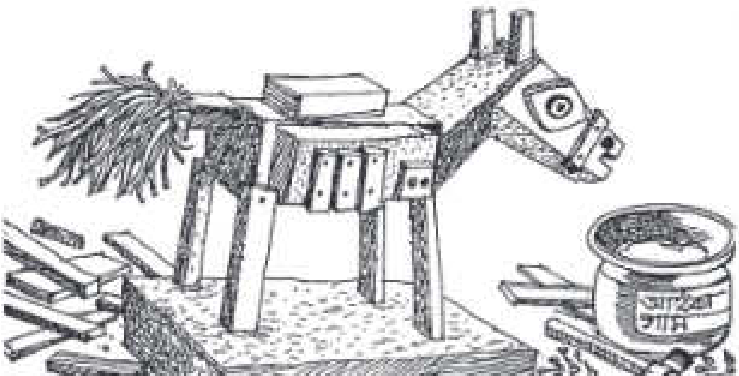

টুকরা কাঠ জোড়া লাগিয়ে নানা রকম ছোটোখাটো ভাস্কর্য তৈরি করা যায়।

গাছের ডাল : একটু ভালোভাবে লক্ষ করলে নানা আকৃতির সাথে মিল খুঁজে পাওয়া যাবে। সেগুলোকে একটু কেটে-ছেঁটে নিলেই ছোটো ভাস্কর্য তৈরি হয়ে গেল। এভাবে ছোটো-বড়ো নুড়ি পাথর খুঁজে এক-আধটু এঁকে এবং দু-চারটি জোড়া লাগিয়ে ভাস্কর্য করা যায়। লোহার তারে কাপড় পেঁচিয়ে এবং একটু মোটা তার হাত দিয়ে বাঁকিয়ে অনেক রকম ভাস্কর্য করা যায়।

পাঠ : ৭

ছবি আঁকার উপকরণ

সাধারণভাবে আঁকার উপকরণ— পেনসিল, কালি, কলম, জলরং, পোস্টার রং, প্যাস্টেল, রংপেনসিল, কাঠকয়লা, ক্রেয়ন, মার্কিং কলম, বিভিন্ন তুলি, তেলরং, কাগজ ও ক্যানভাস। এছাড়াও ইজেল, টেবিল, হার্ডবোর্ড, ক্লিপ, ছুরি, কাঁচি, ব্লেড,

আঠা, তিসির তেল, তারপিন তেল এমনি আরও অনেক কিছুর প্রয়োজন হয় ছবি আঁকার জন্য। সব উপকরণই একসাথে জোগাড় করার প্রয়োজন হয় না। যে মাধ্যমে ছবি আঁকা হবে সেই মাধ্যমেই উপকরণগুলো সংগ্রহ করে নিতে হবে। এখানে কয়েকটি মাধ্যমের বর্ণনা ও উপকরণের বিবরণ দেওয়া হলো।

কাগজ

এক সময় আমাদের দেশে ঢাকা শহর ও তার আশপাশে ছবি আঁকার উপযোগী কাগজ হাতে তৈরি হতো। হাতে তৈরি কাগজকে ইংরেজিতে বলে 'হ্যান্ডমেড' পেপার। প্রায় ২৫/৩০ বছর ধরে এ কাগজ আমাদের দেশে তৈরি হচ্ছে না। তবে আমাদের আশপাশের অনেক দেশেই হ্যান্ডমেড কাগজ তৈরি হচ্ছে। যেমন–ভারত, নেপাল ও মিয়ানমারে। হ্যান্ডমেড কাগজ জলরঙে ছবি আঁকার জন্য সবচেয়ে উপযোগী কাগজ। বাংলাদেশে ছবি আঁকার জন্য যে কাগজ সহজলভ্য তা হলো কার্ট্রিজ কাগজ। কার্ট্রিজ পাতলা ও মোটা দুই–তিন রকম হয়ে থাকে। বেশি মোটা ও খসখসে কার্ট্রিজে জলরঙে ছবি আঁকা যায়। বেশি মসৃণ কাগজে জলরং ছবি ভালো হয় না। ছবি আঁকার জন্য বিদেশের তৈরি অনেক রকম কাগজই পাওয়া যায়।

ছবি আঁকার বোর্ড, ক্লিপ ও ইজেল

ছবি আঁকার কাগজ রাখার জন্য প্লাইউডের তৈরি বা হার্ডবোর্ডের তৈরি একটি বা দুটি বোর্ড প্রয়োজন। আমাদের দেশে হার্ডবোর্ড তৈরি হয় তাই এটি সহজলভ্য। প্রয়োজনমতো মাপের একটি হার্ডবোর্ডের টুকরা করাত দিয়ে কেটে তার কিনারা শিরীষ কাগজে ঘষে মসৃণ করে নিলে ছবি আঁকার বোর্ড তৈরি হয়ে গেল। সাধারণত বোর্ড ৪৫x৬০ সেমি. মাপের হলেই ভালো হয়। সম্ভব হলে বড় ছবি আঁকার জন্য আরও বড়ো বোর্ড তৈরি করে রাখতে পার। জলরং, পোস্টার রং, পেনসিল, কালি–কলম, ক্রেয়ন, প্যাস্টেল এসব মাধ্যমে ছবি আঁকা হয় কাগজে এবং এই কাগজ বোর্ডে ক্লিপ দিয়ে ভালোভাবে আটকিয়ে নিতে হয়। আটকানোর জন্য দুটো থেকে চারটি ক্লিপ অবশ্যই প্রয়োজন।

ইজেল

ইজেল হলো ছবি আঁকার স্ট্যান্ড। ছবি আঁকার বোর্ড ইজেলে রেখে ছবি আঁকতে হয়। জলরং, কালি–কলম, পেনসিল এসব মাধ্যমে ছবি আঁকতে অনেক সময় টেবিলে রেখে, হাতে রেখে বা মেঝেতে রেখে ছবি আঁকা যায়। ইজেলের খুব প্রয়োজন হয় না। কিন্তু তেলরঙে আঁকতে গেলে ইজেল অবশ্যই প্রয়োজন। ইজেল কাঠ এবং অ্যালুমিনিয়ামের হয়ে থাকে।

পাঠ : ৮, ৯, ১০

ছবি আঁকার বিভিন্ন মাধ্যম

বিভিন্ন মাধ্যমেই আমরা ছবি আঁকতে পারি। যেমন— পেনসিল, প্যাস্টেল, কালি–কলম, জলরং, তেলরং, পোস্টার রং ইত্যাদি।

সাদা–কালো ছবি

পেনসিল : কাঠ পেনসিলের গায়ে লেখা থাকে– HB, 1B বা B, 2B, 3B, 4B, 6B। HB হলো মোটামুটি শক্ত শিষ পেনসিল। সাদা কাগজে হালকা ও শক্ত দাগ হয়। 2B-1B এর চেয়ে নরম ও দাগ কাটলে বেশি কালো হয়। এভাবে 3B আরও নরম এবং কালো। 4B-3B–এর চেয়ে নরম ও কালো এবং 6B সবচেয়ে নরম ও কাগজে সবচেয়ে কালো গভীর দাগ কাটে। শুধু এই পেনসিলগুলো দিয়েই সাদা কাগজে সুন্দর সাদা–কালো ছবি হতে পারে। পেনসিলকে নানাদিক থেকে ঘষে বা ছোটো রেখা ও লাইন টেনে আলোছায়ার অনেক রূপ ও পরিবর্তন ফুটিয়ে তোলা যায়।

কালি-কলম : 'চাইনিজ ইঙ্ক' বলি আমরা একদম কালো কালিকে। সম্ভবত চীন দেশের লোকেরা এই কালি প্রথম ব্যবহার করে। প্রথম ব্যবহারের কথা সঠিকভাবে বলা না গেলেও চীনা প্রাচীন ছবি থেকে শুরু করে বর্তমানকালের ছবি দেখলে বোঝা যায় কালো কালি ব্যবহারের প্রাধান্য তাদের ছবিতে খুব বেশি। কালো কালি ও সাধারণ নিবের কলম দিয়ে সুন্দর ছবি আঁকা যায়। তাই এই ছবি হয় সম্পূর্ণ রেখা-প্রধান। নিবের কলমের মতো ড্রইং-কলম বা ড্রইং-নিব কিনতে পাওয়া যায়। নিজেরাও কলম বানিয়ে নিতে পার। বাঁশের সরু কঞ্চি বা খাগের সরু গাছ কেটে তা দিয়ে সুন্দর কলম বানানো যায়। আমাদের দেশের বিখ্যাত শিল্পী জয়নুল আবেদিন তাঁর অনেক ছবি এঁকেছেন এই খাগের কলম ও কালো কালি দিয়ে।

সাদা-কালো : সাদা-কালো ছবি আঁকা যায় আরো কিছু মাধ্যমে। যেমন- কাঠকয়লা (চারকোল), ক্রেয়ন ও কালো রঙের মার্কিং কলমে। তোমাদের বাড়ির সাধারণ কাঠকয়লা দিয়ে আঁকার চেষ্টা করা যেতে পারে। তবে এ কাঠকয়লা ছবি আঁকার জন্য খুব উপযোগী নয়। ছবি আঁকার জন্য একরকম নরম ও সরু কাঠি দিয়ে কয়লা তৈরি হয়ে থাকে এগুলোকে চারকোল বলে। কাগজ, রং ও পেনসিলের দোকানে খোঁজ করলে পেয়ে যাবে। কাঠকয়লা দিয়েও কখনো ঘষে, কখনো রেখা টেনে ছবি তৈরি করা যেতে পারে। তবে কাঠকয়লা বা চারকোল দিয়ে আঁকা ছবিকে স্থায়ী করার জন্য একরকম তরল পদার্থ ছবির উপর স্প্রে করে দিলে কয়লার গুঁড়ো পড়ে যায় না। ফিক্সাটিভ (Fixative) নামে এই তরল পদার্থ রঙের দোকানে খোঁজ করলে পাওয়া যাবে। মোমের মতো কালো ও মেটে রঙের এক ধরনের ছোটো কাঠিরং পাওয়া যায়। তাকেই ক্রেয়ন বলে। ক্রেয়ন দিয়ে ঘষে ঘষে সুন্দর সাদা-কালো ছবি আঁকা যায়। মার্কিং কলম, কালো রং ও অনেক রঙের হয়ে থাকে। কালো মার্কিং কলম সিগনেচার কলম দিয়ে রেখার পর রেখা টেনে সাদা-কালো ছবি আঁকা যায়।

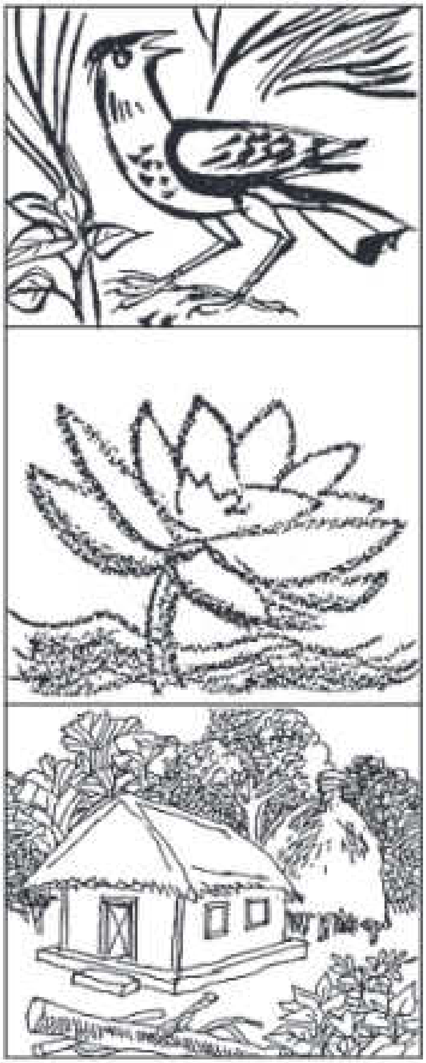

উপরে তুলিতে, মাঝে প্যাস্টেলে বা ক্রেয়নে এবং নিচে কালি-কলমে আঁকা তিনটি ছবি।

আরও অনেক মাধ্যমে সাদা-কালো ছবি তৈরি হতে পারে। যেমন-শুধু কালো রং দিয়ে, জলরং মাধ্যমে এবং কালো ও সাদা পোস্টার রং দিয়ে।

ছবি আঁকার রং

বিভিন্ন রঙে ছবি আঁকা যায়। ছবি আঁকার মাধ্যম রং সম্পর্কে প্রথমেই আমরা একটু জেনে নিই। হলুদ, লাল ও নীল এই তিনটিই হচ্ছে প্রাথমিক রং। হলুদ ও লাল মিশিয়ে হয় কমলা রং লাল ও নীল মিশিয়ে হয় বেগুনি, নীল ও হলুদ মিশিয়ে হয় সবুজ। সুতরাং কমলা, বেগুনি ও সবুজ রংকে বলতে পারি মাধ্যমিক রং। মাধ্যমিক রঙের মতো প্রাথমিক রঙের তিনটি রঙকে পরিমাপের তারতম্য ঘটিয়ে প্রয়োজনমতো অন্যান্য রং তৈরি করা যায় যেমন- উজ্জ্বল সবুজ রং পেতে হলে হলুদের

২০২৫

ভাগ বেশি এবং নীলের ভাগ কম মেশালে তা পাওয়া যাবে। খয়েরি রং তৈরি করার জন্য লাল, হলুদ ও নীল এই তিনটি রঙের তারতম্য ঘটিয়ে মেশাতে হবে। প্রাথমিক রং থেকে একদম কালো রং তৈরি করা সম্ভব না হলেও কাছাকাছি গাঢ় রং তৈরি করা যায়। তবে প্রাথমিক রং হলুদ, লাল ও নীল এই তিনটি রং দিয়ে মোটামুটি একটি রঙিন ছবি আঁকা সম্ভব।

জলরং : পানি মিশিয়ে যে রং দিয়ে ছবি আঁকা হয় এবং যে রং স্বচ্ছ তাকেই জলরং বলা হয়। পানি মিশিয়ে অস্বচ্ছ রং দিয়েও ছবি আঁকা হয় কিন্তু সেগুলোকে জলরং বলা হয় না। স্বচ্ছ রংকেই জলরং বলা হয়। স্বচ্ছ রং হলো একটি রং লাগাবার পর তার উপর আরেকটি রঙের প্রলেপ পড়লে নিচের রংটি হারিয়ে যায় না। আগের রং ও পরের রং দুটোরই অস্তিত্ব অনুভব পাওয়া যায়। বাক্সের ভেতরে চারকোণা 'কেক' হিসেবেও পাওয়া যায়। ট্যাবলেট হিসেবেও এই রং তৈরি হয়ে থাকে। রঙের দোকানে যে পাউডার রং পাওয়া যায় তা পানি দিয়ে গুলিয়ে ছবি আঁকার জন্য জলরং হিসেবে ব্যবহার করা যায়। কটো রং করার জন্য একরকম রঙিন কাগজ পানি দিয়ে ভিজিয়ে জলরং হিসেবে ব্যবহার করা হয়। এ রং কাচের শিশিতেও পাওয়া যায়। ড্রইং কালি হিসেবে বিভিন্ন রঙের কালি কাচের শিশিতে পাওয়া যায়। এ রং দিয়েও জলরঙের ছবি আঁকা যায়। দোকানে কাচের শিশিতে পোস্টার রং পাওয়া যায়। এ রং অবশ্য অস্বচ্ছ রং। তবে জলরঙের মতো করে ছবি আঁকার জন্য এ রং ব্যবহার করা যায়। জলরঙে সাধারণত সাদা রং ব্যবহার করা হয় না এবং তুলি ও রং দিয়ে কাগজে বেশি ঘষাঘষি করা যায় না। দুটি বা তিনটি প্রলেপে (ওয়াশে) ছবি আঁকতে পারলে ছবি সুন্দর হয়।

পোস্টার রং : পোস্টার রং অস্বচ্ছ জলরং। অস্বচ্ছ জলরং হলো একটি রঙের উপর অন্য রঙের প্রলেপ দিলে আগের রংটি সম্পূর্ণ ঢেকে যায়। আগের রঙের অস্তিত্ব হারিয়ে যায়। পোস্টার রঙের মতোই আরেকটি মাধ্যম রয়েছে 'টেম্পারা' নামে। টেম্পারা রঙে ছবি আঁকার সময় বিভিন্ন রঙের সঙ্গে সাদা রং মিশিয়ে রংকে হালকা করা যায়। জলরঙের সাথে সাদা রং মেশালে রঙের স্বচ্ছতা থাকে না। পোস্টার ও টেম্পারা রং এক রং দিয়ে আরেক রংকে সহজেই ঢেকে দেওয়া যায়। যতবার রং দরকার লাগানো যায়।

পাউডার রঙের সাথে সাদা গমের আঠা বা এরাবিক গাম মিশিয়ে এই পদ্ধতিতে ছবি আঁকা যায়। পাউডারের সাথে ডিমের কুসুম মিশিয়ে রঙিন ছবি আঁকা যায়। রং তরল করার প্রয়োজনে ডিমের কুসুমের সাথে পানি মেশাতে হয়। এই পদ্ধতির নাম 'এগ টেম্পারা'। এগ টেম্পারায় কাগজে যেমন ছবি আঁকা যায় তেমনি কাপড়ে, কাঠে ও হার্ডবোর্ডের উপরও আঁকা যায়। প্রাচীনকালে মিনিয়েচার ছবি (ক্ষুদ্র ছবি) এই পদ্ধতিতে আঁকা হতো। এই পদ্ধতিতে আমাদের দেশের অনেক শিল্পীই ছবি এঁকেছেন। শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিনের বিখ্যাত ছবি 'সংগ্রাম' এই পদ্ধতিতে আঁকা।

জলরং, পোস্টার রং, টেম্পারা ইত্যাদি মাধ্যমগুলো সাধারণত কাগজে আঁকতে হয় এবং এগুলোই কাগজে ছবি আঁকার প্রধান কয়েকটি মাধ্যম। আরও কিছু মাধ্যম রয়েছে যেমন– রঙিন মার্কিং কলম, চক ও মোমপ্যাস্টেল, রঙিন পেনসিল ইত্যাদি।

রঙিন মার্কিং কলম : বিভিন্ন রঙের মোটা ও সরু মার্কিং কলম পাওয়া যায় ছবি আঁকার জন্য। এগুলো কাগজে ঘষে লাইন টেনে সুন্দর রঙিন ছবি তৈরি করা সম্ভব। প্যাস্টেলে ছবি আঁকার কাগজ একটু খসখসে হলে ভালো হয়।

তেলরং : তেলরং সাধারণত টিউবে বা কৌটায় নরম পেস্টের আকারে পাওয়া যায়। তিসি তেল ও তারপিন মিশিয়ে এ রং ব্যবহার করতে হয়। এ রঙে ছবি সাধারণত ক্যানভাসে, হার্ডবোর্ডে, কাঠে আঁকা হয়ে থাকে। তবে বিশেষ ধরনের কাগজেও আঁকা যায়। ছবি আঁকার ক্যানভাস হলো একটু মোটা সুতার ঘন বুননের কাপড়। রঙের দোকানে রঙিন অক্সাইড পাউডার হিসেবে পাওয়া যায়। তার সাথে তিসি তেল ও তারপিন মিশিয়ে তেলরং তৈরি করা যায়। তেলরঙের ছবি দীর্ঘদিন স্থায়ী হয়। যুগ যুগ ধরে এ মাধ্যমের ছবি টিকিয়ে রাখা যায়। দেশ–বিদেশের গ্যালারিতে (চিত্রশালা) কয়েক হাজার বছরের পুরোনো ছবি এখনো অক্ষত অবস্থায় টিকে আছে।

নমুনা প্রশ্ন

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১। পৃথিবীর যাবতীয় বস্তুকে কয়টি আকৃতিতে ফেলা যায়?

ক. একটি　　　　খ. দুটি

গ. তিনটি　　　　ঘ. চারটি

২। আলোছায়াকে মোটামুটি কয়ভাগে ভাগ করা যায়?

ক. একভাগে　　　　খ. দুইভাগে

গ. তিনভাগে　　　　ঘ. চারভাগে

৩। কোলাজ ছবি কীভাবে তৈরি করা যায়?

ক. কাগজ ছিঁড়ে ও কেটে　　　　খ. কাঠ কেটে

গ. কাঠ খোদাই করে　　　　ঘ. কাগজে রং লাগিয়ে

৪। ইজেল হলো–

ক. ছবি আঁকার বোর্ড　　　　খ. রং করার প্লেট

গ. ছবি আঁকার স্ট্যান্ড　　　　ঘ. ছবির ফ্রেম

৫। সংগ্রাম ছবিটি কোন শিল্পীর আঁকা?

ক. কামরুল হাসান　　　　খ. এস. এম. সুলতান

গ. জয়নুল আবেদিন　　　　ঘ. হাশেম খান।

ব্যবহারিক

১। রঙিন টুকরা কাপড় জোড়া লাগিয়ে কেটে–ছেঁটে একটি চিত্র তৈরি করো।

২। রঙিন কাগজ কেটে তোমার ইচ্ছেমতো ছবি বানাও। মাপ– ১৫ X ২০ ইঞ্চি।

৩। ছোটো-বড়ো কাঠের টুকরা দিয়ে একটির সাথে আরেকটি লাগিয়ে তোমার ইচ্ছেমতো একটি ভাস্কর্যশিল্প তৈরি করো।

৪। লোহার তার বাঁকিয়ে জোড়া দিয়ে নিচের যেকোনো একটি বিষয়ের রূপ ফুটিয়ে তোলো :

ঘোড়া, হরিণ, মানুষ।

৫। লোহার তারে বা বাঁশের চটায় খড় পেঁচিয়ে একটি ঘোড়া বানাও।

৬। নুড়ি পাথর দিয়ে তোমার পছন্দমতো একটি ভাস্কর্যশিল্প তৈরি করো।

৭। যেকোনো দু–তিনটি খেলনা জিনিসের সমন্বয়ে তোমার ইচ্ছেমতো ছোটোখাটো ভাস্কর্য তৈরি করো। সময়–৩ দিন।

পঞ্চম অধ্যায়

ব্যবহারিক শিল্পকলা

পাঠ : ১, ২ ও ৩

বর্ণমালা ও হাতের লেখা (Typography & Calligraphy)

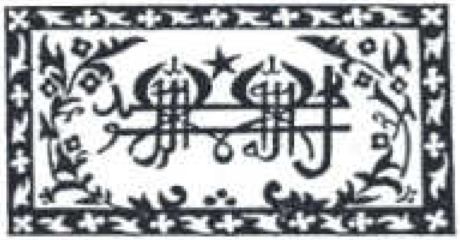

বাংলা ও ইংরেজি ভাষায় কিছু সাধারণ বর্ণমালার চেহারার সাথে আমাদের সবারই পরিচয় আছে। অনেক দিন আগে যখন সিসার টাইপ ব্যবহার হতো হরফের চেহারা ও বৈশিষ্ট্যের কারণে সেগুলোর নামকরণ করা হয়েছিল। যেমন– বাংলা হরফে– বিদ্যাসাগর, রোমান, সুরূপা, প্রগতি, সুশ্রী, আধুনিক ইত্যাদি। ইংরেজিতেও ছিল টাইমস, রোমান, ইউনিভার্স প্রভৃতি। বাংলা হরফে সিসার আগে ব্যবহৃত হতো কাঠের টাইপ। পঞ্চানন কর্মকার ছিলেন এই কাঠের টাইপের আবিষ্কারক।

বিজ্ঞানের কল্যাণে প্রযুক্তির ধাপে ধাপে উন্নতির কারণে বর্তমানে সিসার টাইপের ব্যবহার ও লেটার প্রেসের মুদ্রণ ধীরে ধীরে উঠে যাচ্ছে। দ্রুত জায়গা দখল করে নিচ্ছে– অফসেট মুদ্রণ, ফটোটাইপ ও কম্পিউটার। ফলে টাইপের চেহারার পরিবর্তন ঘটছে দ্রুত। প্রযুক্তি ও কম্পিউটারের কারণে হরফের চেহারা, আকার-আকৃতি যত দ্রুতই পরিবর্তন হোক না কেন মূল চেহারাটা তৈরি করে দিচ্ছে শিল্পীরাই। সেই আদিকাল–কাঠের হরফের আমল থেকে বর্তমান কম্পিউটার যুগ পর্যন্ত হরফের মূল চেহারাটা শিল্পীদের দ্বারাই সম্পন্ন হচ্ছে।

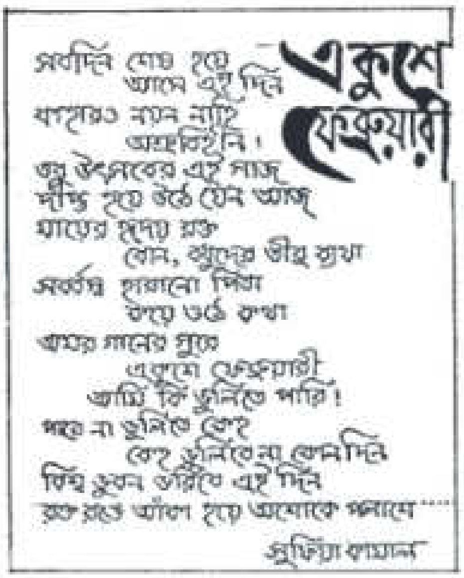

তুলি দিয়ে তিন রকম হাতের লেখা

হরফের শিল্পরূপ রপ্ত করতে হয়। এর জন্য প্রয়োজন কিছুদিন নিয়মিত অনুশীলন করা। কিন্তু ভালো ও দেখতে সুন্দর হরফের হুবহু অনুকরণ করে যেতে হবে। তারপর নিজের ভাবনা ও উদ্ভাবনী শক্তি দিয়ে হরফকে আরও কতরকম নতুন নতুন

চেহারা দেয়া যায় তা নিজেই আবিষ্কার করার চেষ্টা করতে হয়। আগেই বলেছি হরফের যত রকম চেহারা ও শিল্পরূপ তা শিল্পীরাই করেছেন। হরফের কিছু নমুনা, ছবি ও নিয়ম সংগ্রহ করে তা দেখে কিছুদিন নিয়মিত অনুশীলন করে গেলে- সুন্দর করে বাংলা, ইংরেজি লেখায় ও বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় লেখার বা হরফের শিল্পরূপ দিতে পারদর্শী হতে পারবে।

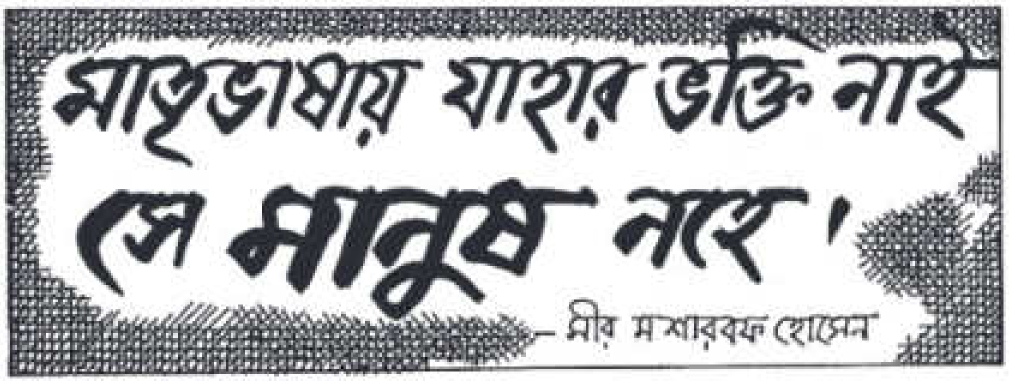

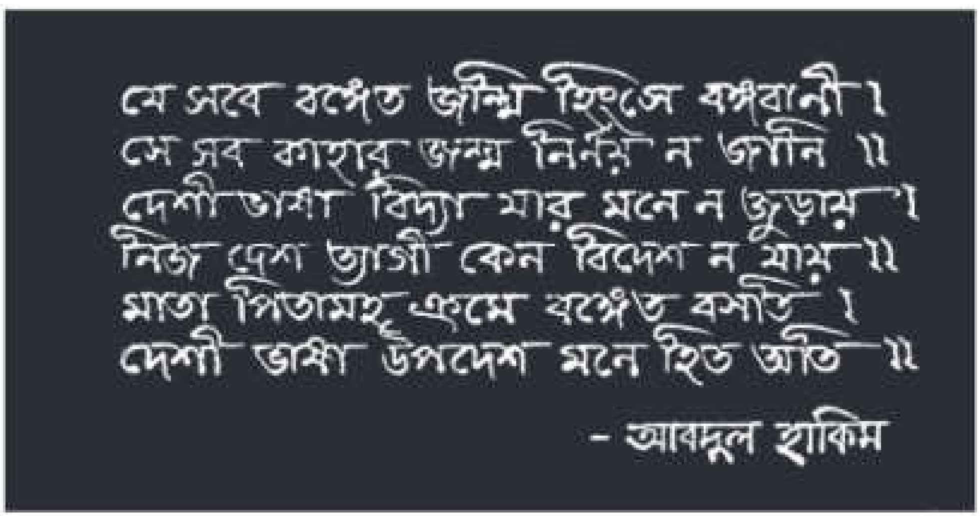

তুলি দিয়ে তিন রকম হাতের লেখা

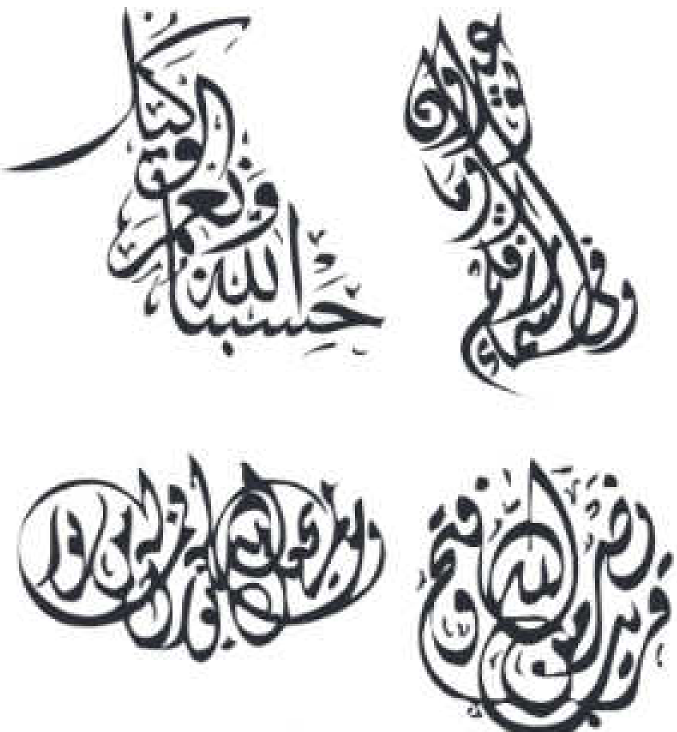

কয়েকটি ইসলামি ক্যালিগ্রাফি

প্রচারের জন্য পোস্টার তৈরিতে, হোর্ডিংয়ে সুন্দর লেখার প্রয়োজন হয়। বিজ্ঞাপনের জন্য টেলিভিশনের প্রচারে, সিনেমার জন্য নানারকম নকশার, লেখার প্রয়োজন। বই-পুস্তকের প্রচ্ছদে, খবরের কাগজে, সাইনবোর্ডে, নাম ফলকে এমনকি রাজনৈতিক প্রচারের জন্য দেয়ালে লেখার প্রয়োজনে হরফের নানারকম শিল্পরূপ দেয়া হচ্ছে। বাণিজ্যিক শিল্পদ্রব্য যেমন ওষুধের লেবেল, মোড়ক বা প্যাকেট, দুধ, বিস্কুট ও অন্যান্য খাবারের প্যাকেট, প্রসাধন দ্রব্য-সাবান, তেল, লোশন ইত্যাদির প্যাকেট এমনি হাজারো কাজে সুন্দর টাইপোগ্রাফি বা লেখাঙ্কন অতি আবশ্যকীয় একটি শিল্পকর্ম।

হস্তলিপি বা হাতের লেখাও একটি শিল্পকর্ম। মুদ্রণশিল্পের আবিষ্কারের আগে যাবতীয় লেখালেখির কাজ হাতের লেখা দিয়েই হতো। রাজা-বাদশার ফরমান জারি-দলিল-দস্তাবেজ, পুথি লেখা, বই লেখা, ধর্মগ্রন্থ লেখা সবই হস্তলেখা বিশারদদের দ্বারা হতো।

বাংলা হস্তলিপির পুরোনো পান্ডুলিপি। তাল পাতার পুথি, দলিল-দস্তাবেজের নিদর্শন আমাদের জাতীয় জাদুঘরের সংগ্রহে রয়েছে। সুন্দর আরবিলিপিতে আছে কুরআন শরীফ। সারা পৃথিবীতেই সুন্দর আরবি হস্তলিপিতে অনেক কুরআন শরীফ রয়েছে। আরবি হস্তলিপিতে ইসলামের অনেক মর্মবাণী বিশেষ চিত্রকলা হিসেবে খ্যাতি লাভ করেছে। যাকে বলা হয় ক্যালিগ্রাফিচিত্র এবং যা ইসলামিক শিল্পকলার বৈশিষ্ট্যময় দিক। যারা হাতের লেখায় পারদর্শী তাদের বলা হয় ক্যালিগ্রাফার। আরবি, ফারসি, উর্দু এসব ভাষার অনেক শিল্পী ক্যালিগ্রাফির মাধ্যমে সুন্দর ছবি করেছেন মোঘল ও পারসিক চিত্রকলায়।

ক্যালিগ্রাফি করতে যেয়ে অনেক শিল্পী লেখাকে বিভিন্ন জীবজন্তু, পাখি, গাছ এসবের অবয়বে ফুটিয়ে তুলেছেন। পাথরের গায়ে খোদাই করা বেশ কিছু আরবি ক্যালিগ্রাফির নিদর্শন জাতীয় জাদুঘরের সংগ্রহে রয়েছে। বাংলাদেশের পুরোনো কিছু মসজিদের গায়েও ইসলামি শিল্পকলার সুন্দর নিদর্শন হিসেবে এই ক্যালিগ্রাফি রয়েছে।

হাতের লেখার বা ক্যালিগ্রাফির গুরুত্ব এখনো রয়েছে। যেমন অনেক দলিল-দস্তাবেজ হাতে লেখা হয়। কাউকে শ্রদ্ধা জানাতে মানপত্রটি সুন্দর হাতের লেখায় তৈরি করার রেওয়াজ এখনো আছে। বিয়ে, জন্মদিন ও আনন্দ অনুষ্ঠানের আমন্ত্রণলিপি হাতে লিখে দেওয়ার নিয়ম সামাজিকভাবে একটা নান্দনিক সংস্কৃতি।

বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের হাতের লেখা খুব সুন্দর। কবিতা লিখতে গিয়ে কবিতার লাইনে কাটাকুটি করে হাতের লেখা ও কাটাকুটির রেখা মিশিয়ে তিনি ছবির রূপ দিয়েছেন। কবি নজরুলের হাতের লেখাও সুন্দর। অনেকেই তাঁদের হাতের

লেখা অনুকরণ করে নিজের হাতের লেখাকে সুন্দর করার চেষ্টা করেন। আমাদের দেশের কয়েকজন বিখ্যাত শিল্পীর হাতের লেখা অনুকরণযোগ্য। শিল্পী কামরুল হাসান ও শিল্পী কাইয়ুম চৌধুরীর হাতের লেখা সবার কাছেই পরিচিত। বাংলাদেশের সংবিধান গ্রন্থে প্রেসের টাইপ ব্যবহার না করে পুরো গ্রন্থটি হাতে লেখা হয়েছে। লিপিকার হলেন শিল্পী আবদুর রউফ। সংবিধান গ্রন্থটি ক্যালিগ্রাফি, অন্যান্য নকশা ও চিত্রের জন্য একটি উল্লেখযোগ্য শৈল্পিক গ্রন্থ। হাতের লেখা সুন্দর করার কিছু নিয়ম এবং ক্যালিগ্রাফির কিছু নিদর্শন এখানে ছাপা হলো। ভালো করে লক্ষ করলে এবং নিয়মিত অভ্যাস করলে তোমরাও ভালো হস্তলিপি বিশারদ বা ক্যালিগ্রাফার হতে পারবে।

পাঠ : ৪, ৫ ও ৬

নকশা (Design)

নকশা বা ডিজাইনের প্রয়োজন ও ব্যবহার মানব জীবনের সর্বত্র। অবশ্য 'নকশা' শব্দটির অর্থ ব্যাপক এবং বিভিন্ন বিষয়ে বিস্তৃত। আমরা এখানে কিছু সাধারণ আকার-আকৃতি, ফুল, পাতা, পাখি, মাছ ও রেখা মিলিয়ে কাগজে নকশা তৈরির কথা আলোচনা করব যা আমাদের দৈনন্দিন কাজে জীবনযাপনের প্রয়োজনে সব সময় ব্যবহার হয়ে থাকে।

বাংলাদেশের লোকশিল্পে নকশার ছড়াছড়ি। নকশিকাঁথা, পাখা, জায়নামাজ, তাঁতে তৈরি শাড়ি বিশেষ করে জামদানি, টাঙ্গাইল শাড়ি, ঢাকাই বিটি শাড়ি, কাতান, বেনারসি ইত্যাদিতে হাজার হাজার নকশার ব্যবহার হয়েছে নানা রঙে। এসব নকশা আঁকার পদ্ধতি ও ব্যবহার ভালোভাবে লক্ষ কর। কাঠের কাজে— দরজায়, খাট-পালং তৈরিতে, বাক্সে-সিন্দুকে, বিভিন্ন আসবাবপত্রে, পাল্কিতে, নৌকায়, কাঠ খোদাই করে উঁচু উঁচু করে নানারকম নকশার কাজ আছে বাংলাদেশে। যেগুলোকে রিলিফ শিল্পকর্ম বলে। পোড়ামাটির ফলকেও এ ধরনের রিলিফ শিল্পকর্ম করা হয়। যার কথা মাটির শিল্পকর্ম অধ্যায়ে বলা হয়েছে। এসব শিল্পকর্ম গভীর মনোযোগ সহকারে দেখো, অনেক নকশার সাথে তোমাদের পরিচয় হবে।

কাঠের পুতুল, হাতি, ঘোড়া, মাটির পুতুল, হাঁড়ি-কলসি, শখের হাঁড়ি, কাঁসা-পিতলের তৈজসপত্র, পিলসুজ, ফুলদানি, গোলাপজলদানি, সুরমাদানি, সিঁদুরপাত্র, অলংকার রাখার পাত্র, সোনা-রুপার অলংকার-এমনি সব ব্যবহারিক দ্রব্যে ডিজাইন ও নকশার ছড়াছড়ি দেখতে পাবে।

একুশে ফেব্রুয়ারির প্রভাতফেরিতে রাস্তায় 'আলপনা' আঁকা ভাষাশহিদদের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপনের একটি বিষয়। আজকাল যেকোনো বিয়েতে, জন্মদিনে, ঈদে, পূজায় ও প্রায় সব আনন্দ-অনুষ্ঠানে আলপনা আঁকা হয় যা বাংলাদেশের-লোকশিল্পের সুন্দর নিদর্শন এবং ফুল, পাতা, গাছ, পাখি ও রেখার মিলিত নকশার রূপ।

বৃত্ত, ত্রিভুজ, চতুর্ভুজ ও রেখা এই চারটি উপাদান নকশা তৈরির প্রধান অবলম্বন। এই চারটি উপাদানকে বিভিন্নভাবে ব্যবহার করে তুমি অনেক রকম নকশা তৈরি করতে পার। ছবির নকশাগুলো ভালোভাবে লক্ষ করো একই উপাদান ও রেখা পুনঃপুন ব্যবহার, নানা ভঙ্গিতে বসিয়ে নকশার ছন্দ ও সুর সৃষ্টি করা হয়েছে। কথাটা আরেকটু পরিষ্কার করে বলি। শব্দের সঙ্গে শব্দের মিল ঘটিয়ে কবিতা ও গানে আমরা যেমন ছন্দ ও সুরের সৃষ্টি করে মনকে আন্দোলিত করি তেমনি নকশা বা ডিজাইনে বিভিন্ন উপাদান পুনঃপুন ব্যবহার করে চোখের দেখায় শুধু সুন্দর রূপ নয় একটা ছন্দ ও সুর সৃষ্টি হয়ে যায় হৃদয়ে।

বৃত্ত, ত্রিভুজ, চতুর্ভুজ ও রেখা এই চারটি উপাদান ইসলামিক শিল্পকলারও প্রধান উপাদান। ইসলামিক শিল্পকলায় জীবজন্তুর ব্যবহার সাধারণত করা হয় না। জ্যামিতিক প্যাটার্নগুলোই প্রাধান্য পেয়েছে।

বাংলাদেশে ইসলামি স্থাপত্যের নিদর্শন বিভিন্ন মসজিদ ও ইমারতগুলো তৈরিতে উপরোক্ত জ্যামিতিক প্যাটার্নগুলোকে নানাভাবে ব্যবহার করে বিভিন্নরকম নকশার কাজ করা হয়েছে।

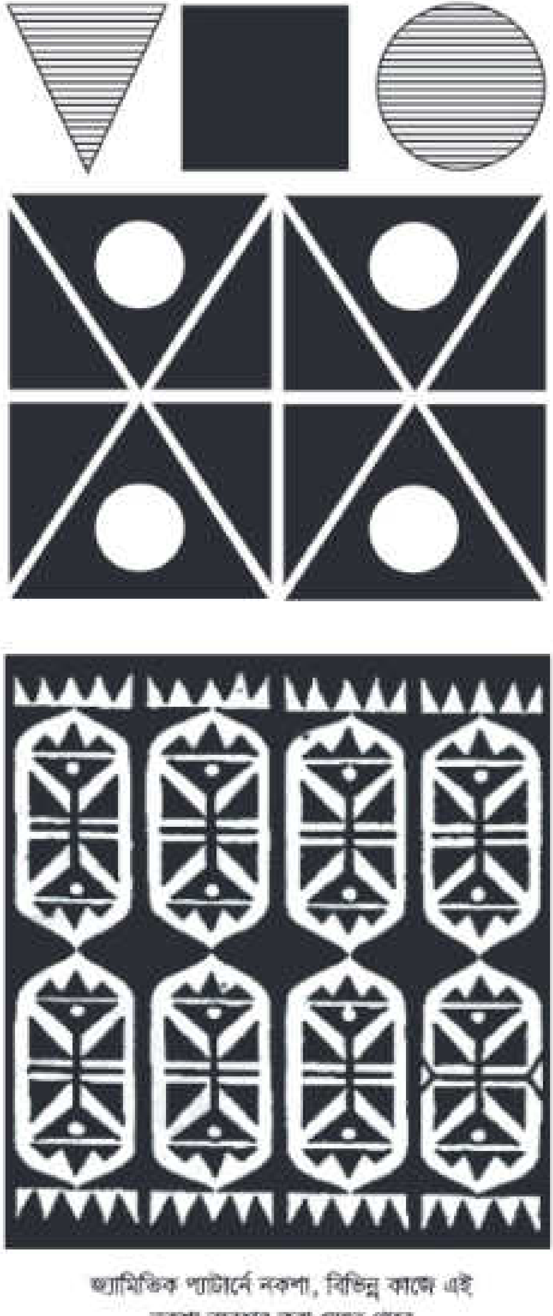

জ্যামিতিক প্যাটার্নে নকশা, বিভিন্ন কাজে এই নকশা ব্যবহার করা যেতে পারে

তিন ধরনের তিনটি আলপনা

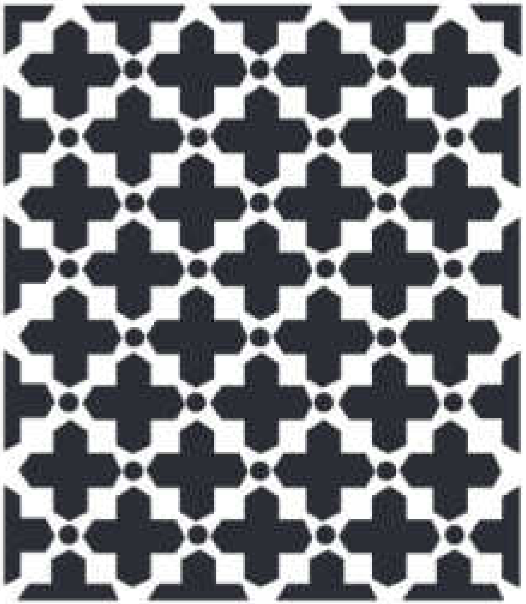

জ্যামিতিক প্যাটার্নে একটি ইসলামিক নকশা।

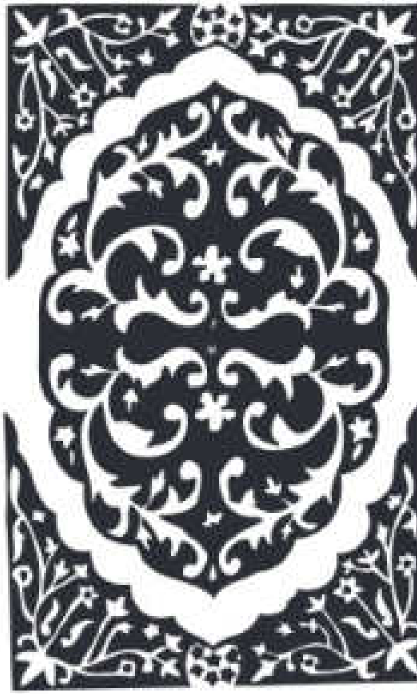

ফুল ও লতাপাতা দিয়ে দুটি নকশা।

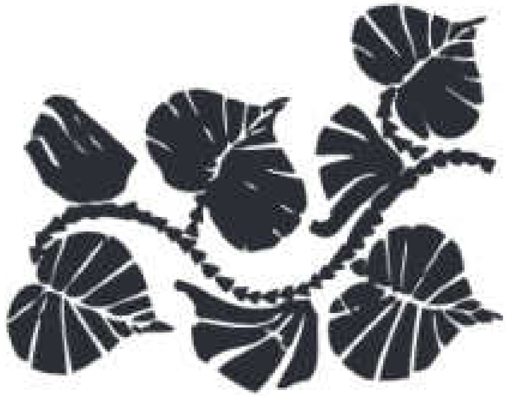

ফুল, লতাপাতা দিয়ে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বারে বারে ব্যবহার করে অনেক রকম নকশা করা যায় এবং তা বিভিন্ন কাজে ব্যবহার করা যায়।

২০২৫

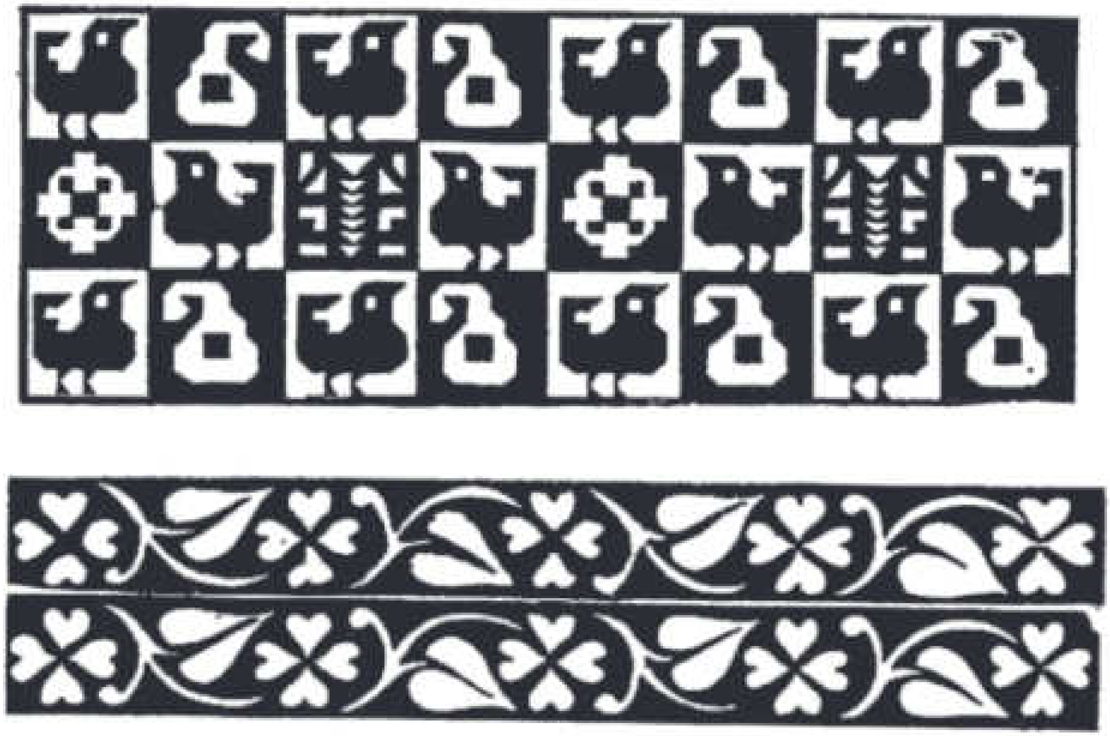

পাখি, ফুল ও লতাপাতার দুটি নকশা

এখানে জ্যামিতিক প্যাটার্নগুলোর নানারকম ব্যবহার দেখানো হয়েছে। তোমরা এভাবে চেষ্টা করো–দেখো কত রকম নকশা তৈরি করতে পার। উপরের ফুল, পাতা, মাছ, পাখি দিয়ে নকশা করার নিয়মগুলো দেখে অভ্যাস করো। নতুন ও সুন্দর নকশা তোমরাও তৈরি করে নিজেদের কাজে ও বিভিন্ন কাজে ব্যবহার করতে পার। যেমন– কাপড় ছাপায়, আলপনা আঁকায়, বই-পুস্তকের প্রচ্ছদে, পোস্টার, দেয়াল পত্রিকায়, আমন্ত্রণলিপিতে, ঈদকার্ড ও বিভিন্ন কারুশিল্পে।

পাঠ : ৭, ৮ ও ৯

গ্রাফিক ডিজাইন (Graphic Design)

ছাপা বা প্রকাশনার জন্য যে ডিজাইন বা নকশা করা হয় তাকেই আমরা গ্রাফিক ডিজাইন বলতে পারি। সারা বিশ্বের প্রকাশনার জগৎ এই গ্রাফিক ডিজাইনের আওতাভুক্ত। বই-পুস্তক ও ম্যাগাজিনের অঙ্গসজ্জা, প্রচ্ছদ, ক্যালেন্ডার, বিভিন্ন পণ্যের প্যাকেট ডিজাইন থেকে শুরু করে ছাপাখানা থেকে মুদ্রিত বিভিন্ন প্রচারণামূলক পোস্টার, অন্যান্য বিষয়ের জন্য নকশা, ছবি ও সামগ্রিকভাবে মুদ্রিত বিষয়ের আঙ্গিক ও সৌন্দর্য নির্ভর করে মূলত এই গ্রাফিক ডিজাইনের উপর। সুতরাং গ্রাফিক ডিজাইন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়।

কম্পিউটার আবিষ্কার বা এর ব্যাপক প্রচলনের পূর্বে একজন গ্রাফিক ডিজাইনার ছাপার জন্য প্রস্তুতকৃত উপাদানের প্রায় সবটুকুই হাতে তৈরি করতেন। ছবি, নকশা ও লেখার শৈলী বা স্টাইল সবই রং, কালি, তুলি, বিভিন্ন প্রকার কলম ইত্যাদি দিয়ে অঙ্কন করা হতো। এছাড়াও এয়ার ব্রাশ, স্কেল, কম্পাস ইত্যাদিও নকশার জন্য ব্যবহার করা হয়।

টাইপোগ্রাফির ব্যবহার গ্রাফিক ডিজাইনের একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। টাইপোগ্রাফি হচ্ছে প্রচ্ছদ, ক্যালেন্ডার, পণ্যের মোড়ক বা অন্যান্য প্রয়োজনে ব্যবহারের জন্য ছাপার অক্ষর বা হরফে স্টাইল। বিভিন্ন স্টাইলের লেখা গ্রাফিক ডিজাইনের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। গ্রাফিক ডিজাইনের জন্য প্রয়োজন পোস্টার রং, চাইনিজ ইঙ্ক, বিভিন্ন মাপের তুলি, কম্পাস, কাগজ, পেনসিল ইত্যাদি। এখন কম্পিউটারের ব্যাপক ব্যবহারের ফলে অন্যান্য সমস্ত ক্ষেত্রের মতো গ্রাফিক ডিজাইনের ক্ষেত্রে এসেছে চমকপ্রদ পরিবর্তন। কম্পিউটার গ্রাফিকস এখন একটি বহুল পরিচিত শব্দ।

শিল্পী সনজীব দাস অপুর আঁকা একটি পোস্টার

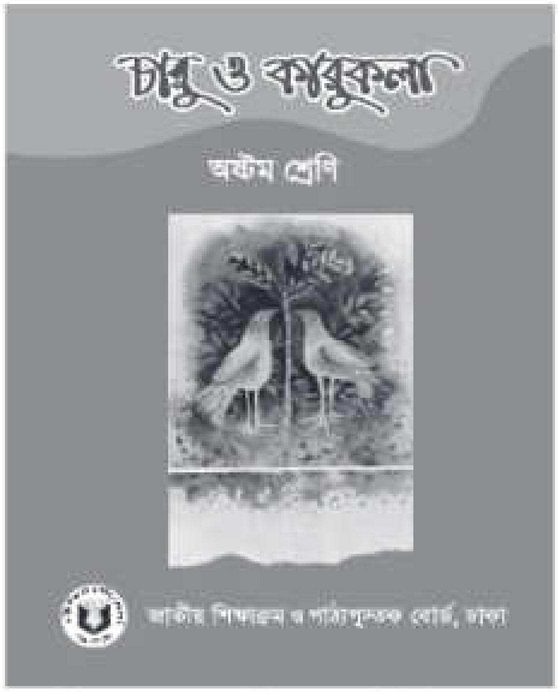

শিল্পী হাশেম খানের ছবি দিয়ে করা একটি বইয়ের প্রচ্ছদ

কম্পিউটার গ্রাফিক শেখার জন্য আজকাল বহু প্রতিষ্ঠান রয়েছে। ছাপার জন্য ব্যবহৃত যাবতীয় নকশা এখন একজন গ্রাফিক ডিজাইনার বিশেষ সফটওয়্যার ব্যবহার করে কম্পিউটারের মাধ্যমেই সম্পাদন করে থাকেন। এর ফলে মুদ্রণে এসেছে ব্যাপক পরিবর্তন। সারা বিশ্বের মুদ্রণশিল্প এখন বলা যায় উন্নতির চরম শিখরে বিরাজ করছে। তাই ছাপা সংক্রান্ত বিষয়ে ব্যাপক অভিজ্ঞতাসম্পন্ন শিল্পীর উপর সমগ্র দেশের মুদ্রণ শিল্পের ভবিষ্যৎ নির্ভর করে। সুতরাং একজন দক্ষ গ্রাফিক ডিজাইনার হিসেবে নিজেকে আত্মনির্ভরশীল করা সম্ভব।

পাঠ : ১০, ১১ ও ১২

ফ্যাশন ডিজাইন (Fashion design)

চলতি প্রথা, রীতি বা স্টাইলকে ফ্যাশন বলা হয়। এটি হতে পারে পোশাক, আসবাব অথবা গয়নাসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে। এমনকি হেয়ার স্টাইলও এর বাইরে নয়। তবে Fashion (ফ্যাশন) শব্দটি বহুল ব্যবহৃত হয় পোশাকের ক্ষেত্রেই। আর ফ্যাশন ডিজাইন বলতেও আমরা বুঝি কোনো বিশেষ অঞ্চলের জনগোষ্ঠীর ব্যবহৃত পোশাকের জনপ্রিয় আকার–আকৃতি ও প্রস্তুতপ্রণালি।

২০২৫

ফ্যাশন শব্দটির আভিধানিক অর্থ প্রচলিত রীতি। সময়ের সাথে সাথে এ রীতির পরিবর্তন হয়। তাই একে আমরা সময়োপযোগী রীতিও বলতে পারি। সভ্যতার সাথে ক্রমবর্ধমান সংস্কৃতির পরিবর্তন ঘটেছে যুগে যুগে। পরিবর্তন, পরিবর্ধন, পরিমার্জন, কখনো-বা সংযোজন-বিয়োজন নিয়ে ফ্যাশন চলে এসেছে সময়ের সাথে সাথে।

একটি টি-শার্ট এবং একটি সালোয়ার-কামিজের নমুনা

যেমন– কখনো হয়তো ঢিলেঢালা পোশাক পরতে মানুষ পছন্দ করে, তখন সবাই ঐ রকম পোশাক পরে এবং ঐটাই তখনকার ফ্যাশন। আবার কখনো আঁটসাঁট পোশাক জনপ্রিয় হয়। সুতরাং ওটাই সে সময়ের ফ্যাশন। এজন্য ফ্যাশন দীর্ঘস্থায়ী নয়।

বিভিন্ন দেশের ক্ষেত্রে এই ফ্যাশন সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থা বা মর্যাদা প্রকাশ করে। উনিশ ও বিশ শতকে ফ্যাশনকে কেন্দ্র করে সারা বিশ্বে ফ্যাশন হাউস ও ফ্যাশন ম্যাগাজিনের রমরমা ব্যবসা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এর কারণ মানুষের জীবনযাত্রার মান বেড়েছে। আর তার সাথে পাল্লা দিয়ে বেড়েছে মানুষের ফ্যাশন সচেতনতা।

পাশ্চাত্যে ও আমেরিকাতে ফ্যাশনেবল পোশাক রপ্তানি করে বাংলাদেশও আজ তার অর্থনৈতিক ভিতকে মজবুত করে গড়ে তুলছে। আমাদের দেশের গার্মেন্টস ইন্ডাস্ট্রিগুলো পোশাক ও পোশাকের ফ্যাশনকে অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়েছে। তাই পোশাক প্রস্তুতকারী গার্মেন্টসগুলোর সংগঠন BGMEA নিজেরাই একটি ফ্যাশন ডিজাইন শিক্ষার প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলেছে। তাছাড়াও বিভিন্ন বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে ফ্যাশন ডিজাইনের উপর রীতিমতো ডিগ্রি দেয়া হচ্ছে। পোশাক যে একটা শিল্প, একথা আজ আর কারো অপেক্ষা রাখে না। শ্রেণি, পেশা, বয়স, সামাজিক অবস্থানভেদে সবার কাছেই ফ্যাশনেবল পোশাক এখন গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। কাজেই একে এখন আর কেবল শখ বলা যাবে না। বরং পোশাকের সাথে মিলিয়ে জুতা, স্যান্ডেল, হ্যাট, টুপি, গয়না, ছাতা সবই এখন হওয়া চাই ফ্যাশনেবল।

তবে ফ্যাশন অবশ্যই হতে হবে নিজ নিজ সমাজ, সংস্কৃতি, আবহাওয়া ও আরামের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। বাংলাদেশে এখন প্রচুর ফ্যাশন হাউস হয়েছে। আর নিত্যনতুন ডিজাইনের পোশাকের সমাহারও বাজারে লক্ষ করা যাচ্ছে। তাই

ফ্যাশন ডিজাইনারের রয়েছে ব্যাপক চাহিদা। শিল্পরুচি, সঠিকভাবে রঙের সমন্বয়বোধ ও স্টাইলিশ পোশাক সম্পর্কে ধারণা এই পেশাকে সমৃদ্ধ করতে পারে।

এর সাথে সম্পৃক্ত আছে আমাদের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য আবহমান বাংলার লোকায়ত ধারা, আমাদের রুচি, মূল্যবোধ স্বকীয়তা ইত্যাদি। প্রতিটি জাতির একটা নিজস্ব ধারা বা ঐতিহ্য আছে। আর এই ঐতিহ্যের প্রতিফলন ঘটে তাদের আচার-আচরণ, খাদ্যাভাস, পোশাক-পরিচ্ছদ ইত্যাদিতে।

বর্তমান তথ্যপ্রযুক্তি-নির্ভর গ্লোবাল ভিলেজে এখন আমরা বিশ্ব-সংস্কৃতির প্রবাহে আপন সংস্কৃতিকেও তুলে ধরেছি। নিজ সংস্কৃতির ধারাকে অক্ষুণ্ণ রেখে কখনো-বা পাশ্চাত্যের ধারার সংমিশ্রণে আমরাও সময়কে ধারণ করেছি বিশ্বায়নের সাথে। এর প্রভাবে আমাদের পোশাকশিল্পেও ঘটেছে ভিন্নমাত্রা। বৈচিত্র্য এসেছে তার ডিজাইনে। আমাদের দেশের অনেক ডিজাইনারদের পোশাক বিশ্ববাজারে সমাদৃত হয়েছে। এক্ষেত্রে বিশ্বখ্যাত তারকা মডেল বিবি রাসেলের নাম আমরা উল্লেখ করতে পারি।

দেশীয় তাঁতশিল্পকে উজ্জীবিত করে তাঁতের বোনা কাপড়ে আধুনিক ফ্যাশনে তিনি পোশাক তৈরি করে একদিকে যেমন দেশীয় তাঁতের পুনর্জীবন দিয়েছেন, তেমনি দেশের নতুন প্রজন্মকে উদ্বুদ্ধ করেছেন এই শিল্পে তাদের মেধা-মনন প্রয়োগ করে একটা নতুন ধারার উন্মেষ ঘটাতে।

বাঙালির ঐতিহ্য ও গৌরবময় উৎসব পহেলা বৈশাখ। ফ্যাশন হাউসগুলো ক্রেতাদের আগ্রহের বিষয়টি বিবেচনা করে প্রতিবছর বৈশাখ বরণের জন্য তৈরি করে আবহাওয়া-উপযোগী আরামদায়ক সুতিপোশাক। পোশাকে বর্ণিল হয়ে উঠতে চায় সব বাঙালি।

আবার ২৬শে মার্চ উপলক্ষে লাল-সবুজের বিশেষ আয়োজনে মেয়েদের জন্য টপস, সালোয়ার-কামিজ, ছেলে-মেয়েদের ফতুয়া ও ছেলেদের নানা ডিজাইনের পাঞ্জাবি তৈরি করে। মহান ভাষার মাসে আমাদের ভাষার প্রতি সম্মান ও ভালোবাসা প্রকাশ করে আমাদের প্রিয় বর্ণমালা দিয়ে ছোটো-বড়ো সবার জন্য নানারকমের রুচিশীল পোশাক তৈরি করে। আবার প্রকৃতিতে যখন ফাগুনের আগমন ঘটে তখন তাকে বরণ করতে ফ্যাশন হাউসগুলো বাহারি পোশাকে আমাদের মনও রাঙিয়ে তোলে।

আমাদের জাতীয় দিনসমূহ, ধর্মীয় উৎসবে অথবা বাঙালির ঐতিহ্যময় দিনগুলোতে নিত্যনতুন রং-বেরঙের এর নতুন নতুন ডিজাইনে পোশাকশিল্পে একটা আধুনিক ধারা তৈরি হয়েছে। এই শিল্পকে সমৃদ্ধ করার ক্ষেত্রে একজন চারু ও কারুশিল্পীরও বিশাল ভূমিকা থাকে। কারণ তোমরা ইতিমধ্যে যেসব নকশা বা ডিজাইন শিখেছ তার বহুমাত্রিক প্রয়োগ ও পোশাকের ডিজাইনের সমন্বয় করে তুমিও হয়ে উঠতে পার একজন সফল ফ্যাশন ডিজাইনার।

পাঠ : ১৩, ১৪ ও ১৫

অভ্যন্তরীণ সাজসজ্জা (Interior Decoration)

আধুনিককালে আবাসগৃহ বা অফিস কক্ষের ভিতরে প্রয়োজন ও রুচি অনুযায়ী যে সাজসজ্জা করা হয় তাকে ইন্টেরিয়র ডেকোরেশন বা অভ্যন্তরীণ সাজসজ্জা বলা হয়। সৌন্দর্যপিয়াসী মানুষ যেমন প্রকৃতির বাহ্যিক রূপ দেখে দেখে বিমোহিত হয়েছে, তেমনি ঐ সৌন্দর্যের ছোঁয়া তার অভ্যন্তরীণ জীবনযাপনের সর্বক্ষেত্রে প্রয়োগ করেছে অনেক পূর্ব থেকে। এটি যেমন তার সুরুচির পরিচয় বহন করে তেমনি পরিচ্ছন্ন-পরিপাটি পরিবেশে সে জীবনযাপনে একধরনের স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করে। চারু ও কারুকলা বিষয়টি এ বিষয়ে অনেক ভূমিকা রাখতে পারে। আজকাল আবাসিক বাসা, অফিস, অডিটরিয়াম,

বড়ো বড়ো স্থাপত্য প্রতিষ্ঠান, নানা প্রকার শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, শপিংমল, হোটেল, মোটেল, রেস্টহাউস নানা ফ্যাশন হাউস থেকে শুরু করে অনেক জায়গাই অভ্যন্তরীণ সাজসজ্জা করে এর ভেতরে একটা নান্দনিক আবহ তৈরি করা হয়, যা দেখে আমাদের মনপ্রাণ, চোখ জুড়িয়ে যায়। সুন্দর পরিবেশে কাজে আনন্দ পাওয়া যায়, মনেও আনন্দ থাকে।

একটি আধুনিক অভ্যন্তরীণ গৃহসজ্জার নমুনা

অভ্যন্তরীণ সাজসজ্জা সাধারণত বাড়ি বা অফিস কক্ষের ব্যবহারকারীর বিবিধ প্রয়োজন, তার রুচি, সংস্কৃতি ও আবহাওয়ার সাথে সামঞ্জস্য রেখে করা হয়। অলংকরণ বা সাজসজ্জা শুধু কক্ষসমূহের দেয়াল, মেঝে বা ছাদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে না। ভবন বা কক্ষে ব্যবহৃত বৈদ্যুতিক আলো আসবাবপত্র ইত্যাদিও সাজসজ্জার অংশে হিসেবে বিবেচিত হয়। ঘরে কোন কোন আসবাবপত্রকে গুরুত্ব দেওয়া উচিত এবং কোন কোন আসবাবপত্রকে গুরুত্ব দেওয়া উচিত নয় এ বিষয়টির উপরও সাজসজ্জার সার্থকতা অনেকটাই নির্ভর করে। অতিরিক্ত জিনিসপত্র থাকলে গুরুত্বপূর্ণ জিনিসও গুরুত্ব হারিয়ে ফেলে। সুতরাং আগে থেকে চিন্তা-ভাবনা করে প্রয়োজনের গুরুত্বকে মাথায় রেখে এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিতে হয়। এছাড়াও দেয়ালের রং এবং মেঝের টাইলস বা কার্পেটের রংও গুরুত্বপূর্ণ। মূলত গৃহের অভ্যন্তরীণ সাজসজ্জার জন্য রেখা, ফর্ম, আলো এবং রঙের গুরুত্বই সবচেয়ে বেশি। রঙের ব্যবহারের তারতম্যের কারণে ছোট কক্ষকেও অপেক্ষাকৃত বড় মনে হয়। ছাদের উচ্চতা কখনো বেশি আবার কখনো কম মনে হয়। তাই রং নির্বাচনের ক্ষেত্রে সতর্কতা অবলম্বন করা প্রয়োজন। শয়ন কক্ষের রং হওয়া উচিত হালকা ও দৃষ্টিকে পীড়া দেয় না এমন। যাতে দেয়ালে চোখ রাখলে আরামবোধ হয়, সহজে ঘুম আসে। গাঢ় উজ্জ্বল রং মনকে উত্তেজিত করে। ফলে তা ঘুমে ব্যাঘাত ঘটাতে পারে। অন্যদিকে বসার ঘরের জন্য কিছুটা উজ্জ্বল রং ব্যবহার করা ভালো। তাছাড়া নানারকম ওয়াল পেপার দিয়েও ঘরের দেয়ালকে আকর্ষণীয় করা যায়। দরজা-জানালার পর্দার রংও গুরুত্বপূর্ণ, যা ঘরের দেয়ালের রঙের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হতে হবে। ঘরের কক্ষগুলো যতই সুন্দর করে সাজানো হোক না কেন তাতে যদি যথাযথভাবে আলোর প্রয়োগ করা না যায় তবে পুরোটাই বৃথা হবে। সুতরাং এটা মনে রাখতে হবে যে, সুন্দর রং নির্বাচন, আকর্ষণীয় পর্দা আর আসবাবপত্রের সঠিক ব্যবহার সত্ত্বেও শুধু আলোর যথাযথ ব্যবহার না করার কারণে অসম্পূর্ণ থেকে যাবে সাজসজ্জার কাজটি। বিভিন্নভাবে ঘরে আলোর প্রয়োগ করা যায়। বাল্ব, স্পটলাইট, ল্যাম্পশেড, স্ট্যান্ড

ল্যাম্প প্রভৃতি ব্যবহার করা যেতে পারে। সেক্ষেত্রে বিশেষ বিশেষ কিছু জিনিসের উপর দৃষ্টি আকর্ষিত করার জন্য সেখানে স্পট লাইটের আলো ফেলা যেতে পারে। যেমন–শো-পিস, পেইন্টিং ইত্যাদি। আবার বসার ঘরে পুরো কক্ষকে আলোকিত না করে আলো–আঁধারির পরিবেশ তৈরি করা যেতে পারে। তাছাড়া সুন্দর সুন্দর ল্যাম্পশেডের ব্যবহার ঘরের শোভা বাড়িয়ে তোলে। কেবল যথাস্থানে তা স্থাপন করতে হবে। তবে অভ্যন্তরীণ সাজসজ্জা অনেকটাই নির্ভর করে অধিবাসীর রুচি ও চাহিদার উপর। এ বিষয়ে প্রথাগত শিক্ষা ও জ্ঞান অর্জনের মাধ্যমে অভ্যন্তরীণ সাজসজ্জার কাজকে দৃষ্টিনন্দন, মনোমুগ্ধকর ও আকর্ষণীয় করে করা সম্ভব।

নমুনা প্রশ্ন

লিখে জবাব দাও

১। জামদানি শাড়ি, নকশিকাঁথা, জায়নামাজ, কাঠের দরজায় কী ধরনের নকশা থাকে– বিবরণ দাও।

২। মসজিদ, মন্দির ও প্যাগোডায় কী ধরনের শিল্পকর্ম ও নকশা থাকে– বর্ণনা দাও।

৩। গ্রাফিক ডিজাইন (Graphic Design) কাকে বলে? গ্রাফিক ডিজাইন–এর কাজের দিকগুলো উল্লেখ করো।

৪। ফ্যাশন ডিজাইন (Fashion Design) বলতে তুমি কী বোঝ? আমাদের দৈনন্দিন জীবনে ফ্যাশনের প্রভাব সম্পর্কে তোমার মতামত ব্যক্ত করো।

৫। গৃহ অভ্যন্তরীণ সাজসজ্জার (Interior Design) প্রয়োজনীয়তা বর্ণনা করো।

৬। গৃহ অভ্যন্তরীণ সাজসজ্জায় (Interior Design) কোন কোন বিষয়গুলো গুরুত্বারোপ করতে হবে, তা উল্লেখ করো।

ব্যবহারিক : হাতে–কলমে

নিচের কবিতাংশ সুন্দর হরফে লিখে চিত্রের রূপ দাও।

১। মোদের গরব মোদের আশা
আ মরি বাংলা ভাষা
–অতুলপ্রসাদ সেন

২। মাতৃভাষায় যাহার ভক্তি নাই
সে মানুষ নহে।
–মীর মশাররফ হোসেন

৩। আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো
একুশে ফেব্রুয়ারি
–আবদুল গাফ্‌ফার চৌধুরী

৪। আমার সোনার বাংলা

আমি তোমায় ভালোবাসি

চিরদিন তোমার আকাশ তোমার বাতাস

আমার প্রাণে বাজায় বাঁশি।

–রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

মাধ্যম : কাগজ ও কালো কালি

কাগজের মাপ : ৫ x ৮ ইঞ্চি।

সময় : ২ দিন।

৫। বৃত্ত, চতুর্ভুজ, ত্রিভুজ ও রেখা, এই চারটি উপাদান দিয়ে কাগজের উপর কালো কালিতে একটি নকশাচিত্র আঁক। নকশার মাপ ৫ x ৫ ইঞ্চি।

সময়– ৩ ঘণ্টা।

ফুল, পাখি, পাতা ও রেখা দিয়ে কালো রং ও অন্য একটি রঙে কাগজের উপর একটি নকশা চিত্র তৈরি করো। নকশার মাপ ৫ x ৫ ইঞ্চি।

সময়– ৩ ঘণ্টা।

৬। স্কুলের বাংলা শিক্ষকের বিদায় উপলক্ষ্যে একটি সুন্দর মানপত্র তৈরি করো। মানপত্রে থাকবে হাতের লেখা বা ক্যালিগ্রাফি, লতাপাতা দিয়ে নকশা। মানপত্রের কাগজের মাপ ও কত রঙের করবে তা নিজেই ভেবে নেবে।

সময়– ৩ দিন।

৭। স্কুলের বার্ষিক পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠানের জন্য একটি ৪ পৃষ্ঠার (মাঝখানে ১টি ভাঁজ) আমন্ত্রণলিপি তৈরি করো। কার্ডের মাপ– ৫ x ৬ ইঞ্চি। রং কালো ও যেকোনো ১টি রং।

কার্ডের প্রথম পৃষ্ঠায়– নকশা, স্কুল ও অনুষ্ঠানের নাম।

দ্বিতীয় পৃষ্ঠায় কিছু নকশা ও অনুষ্ঠানসূচি।

তৃতীয় পৃষ্ঠায় আমন্ত্রণলিপি।

চতুর্থ পৃষ্ঠায় নকশা দিয়ে সামান্য অলংকার। প্রেসের কোনো টাইপ ব্যবহার চলবে না। হাতের লেখা ব্যবহার করো।

সময়– ২ দিন।

৮। একুশে ফেব্রুয়ারি উদ্‌যাপনের জন্য রাস্তায় আলপনা করার জন্য একটি ছোটো আকারের সাদা-কালো আলপনা কাগজের উপর আঁকো। কাগজের মাপ– ৮ x ৮ ইঞ্চি।

সময়– ৩ ঘণ্টা।

নবম শ্রেণির জন্য ব্যবহারিক শিল্প
ছবি আঁকা, বর্ণমালা শেখা, নকশা ও গ্রাফিক ডিজাইন

ছবি আঁকা

১। বাস্তব জীবন ও প্রকৃতি থেকে স্কেচ এবং সরাসরি ড্রইং– ক্লাসের সংখ্যা–৫টি। মাধ্যম : পেনসিল ও কালি–কলম। শিক্ষক মাঝে মাঝে ছাত্রদের নিয়ে সরাসরি প্রকৃতির ভেতর যাবেন। কাগজ, বোর্ড, পেনসিল বা কালি–কলম নিয়ে গাছপালা, ঘরবাড়ি, মাঠে, নদীর ঘাটে বা জঙ্গলের পাশে বসে ছবি আঁকার ক্লাস নেবেন। ছাত্রছাত্রীরা প্রকৃতি থেকে যে কোনো বিষয়ে সরাসরি (ফ্রি হ্যান্ড) ড্রইং করবে, স্কেচ করবে– সংখ্যায় যতগুলো সম্ভব একটির পর একটি করে যাবে।

ক্লাস ছাড়াও ড্রইং, স্কেচ সব সময়ই একজন ছবি আঁকিয়ে ছাত্রকে করতে হয়। এজন্য প্রত্যেক ছাত্রের কাছে সব সময় একটি স্কেচ খাতা রাখতে হয়। সঙ্গে প্রয়োজনীয় পেনসিল বা কলম। যখনই সময় ও সুযোগ পাবে স্কেচ বা ড্রইং করতে হয়। বেড়াতে গেলে, বাজার–হাটে, মাঠে, ট্রেনে–স্টিমারে সর্বত্রই স্কেচ খাতা থাকবে একজন শিল্পীর সার্বক্ষণিক সঙ্গী। সব সময় নিয়মিত ড্রইং ও স্কেচ করলে একজন শিল্পী ড্রইং–এ দক্ষ হয়, সাহসী হয়ে ওঠে এবং ছবি আঁকা বিষয়ে জানতে পারে অনেক।

ড্রইং ও স্কেচ ছাড়া প্রকৃতি থেকে বিষয় নিয়ে কাগজের উপর পেনসিল বা কালি–কলমে ধরে ধরে স্টাডি বা অনুশীলন করতে হবে।

এখানে কিছু উদাহরণ দেয়া হলো–

১। ফ্রি হ্যান্ড ড্রইং স্কেচ ও অনুশীলন।

২। স্থিরচিত্র (স্টিল লাইফ)। ক্লাস ৫টি–কলসি, হাঁড়ি, পাতিল, বোতল, বৈয়াম, গ্লাস, মাটির পাত্র বা যেকোনো পাত্র সাজিয়ে স্থিরচিত্র বিষয় করে আলোছায়া ও আঁকার অন্যান্য নিয়ম পালন করে অনুশীলন করে যেতে হবে পরপর কয়েকটি।

একেকটি ক্লাসের সময়– ৩ থেকে ৪ দিন। মাধ্যম– পেনসিল ও রঙিন প্যাস্টেল।

৩। প্রকৃতি থেকে ইচ্ছেমতো বিষয়– (কম্পোজিশন) ক্লাস– ৮টি

মাধ্যম– জলরং, পোস্টার রং, প্যাস্টেল রং বা ইচ্ছেমতো।

একেকটি ক্লাসের সময়– ৪ থেকে ৫ দিন।

প্রকৃতি থেকে বিষয় ঠিক করবে ছাত্ররা নিজের ইচ্ছেমতো। কোনো গ্রামের বাড়ি, নদীর ঘাট, নৌকা, মাছধরা, ধানকাটা ইত্যাদি। শহর হলে কোনো বস্তি, রাস্তার দৃশ্য, গলির দৃশ্য, চিড়িয়াখানার দৃশ্য, শিশু পার্কের দৃশ্য ইত্যাদি বিষয় হতে পারে। গ্রামে ও শহরে অনেক উৎসব ও অনুষ্ঠান হয় সেগুলোও বিষয় হতে পারে। যেমন– যাত্রা, নাটক, কবিগানের লড়াই, একুশে ফেব্রুয়ারি, বিজয় দিবস, স্বাধীনতা দিবস ইত্যাদি। নিজের প্রিয় পশুপাখিকে নিয়ে চিত্র রচনা হতে পারে। মানুষের বিভিন্ন জীবন ও পেশা নিয়ে বিষয় হতে পারে। যেমন-রিকশাওয়ালা, ঠেলাগাড়িওয়ালা, ফেরিওয়ালা, জেলে, কামার, কুমার এমনি অনেক কিছুকে বিষয় করে রং-রেখা, আলোছায়া, পরিপ্রেক্ষিতে ইত্যাদি নিয়মগুলো যথাসম্ভব ঠিক ঠিক তুলে ধরে একটি জমাট কম্পোজিশন বা চিত্র রচনা করতে হবে।

বর্ণমালা শেখা–

ক্লাসের সংখ্যা–৩টি (সম্ভব হলে আরও বেশি) প্রতিটি ক্লাসের সময়– ৩ দিন

১। ধরে ধরে বাংলা বর্ণমালা ও ইংরেজি বর্ণমালা সুন্দরভাবে লেখার জন্য কয়েকবার অনুশীলন ও অভ্যাস করতে হবে। (প্রচলিত ছাপা হরফ থেকে)

২। হাতের লেখা বারবার লিখে অভ্যাস ও অনুশীলন করে সুন্দরভাবে লিখতে জানতে হবে।

৩। শিক্ষক একটি কবিতাংশ বা কোনো মহৎ লোকের বাণী সংগ্রহ করে ছাত্রদের দেবেন। তারা কবিতাংশ সুন্দরভাবে লিখে ও নকশা করে চিত্রের রূপ দেবে। যেমন–

'মোদের গরব মোদের আশা
আ মরি বাংলা ভাষা'

'মাতৃভাষায় যাহার ভক্তি নাই
সে মানুষ নহে।'

নকশা

ক্লাসের সংখ্যা–৩টি (সম্ভব হলে আরও বেশি), প্রতিটি ক্লাসের সময়– ৩ দিন।

১। বৃত্ত, চতুর্ভুজ, ত্রিভুজ ও রেখা দিয়ে বিভিন্নভাবে সাজিয়ে নকশাচিত্র তৈরি করবে।

ক) নকশার মাপ– ৬″ X ৬″ সাদা–কালো রং, কাগজের উপর– ৩টি ভিন্ন ভিন্ন নকশা।
খ) নকশার মাপ– ৮″ X ৮″ ২ রং বা ৩ রং– কাগজের উপর– ৩টি ভিন্ন ভিন্ন নকশা।

গ্রাফিক ডিজাইন

ক্লাসের সংখ্যা– ৩টি (প্রতিটি ক্লাস ২ দিন)

ক. স্কুল ম্যাগাজিনের জন্য প্রচ্ছদচিত্র অঙ্কন (যেকোনো মাধ্যম)।

খ. 'বৃক্ষরোপণ ও পরিবেশ সংরক্ষণ'–এর উপর পোস্টার অঙ্কন (যেকোনো মাধ্যম)।

নমুনা প্রশ্ন (ব্যবহারিক)

১। প্রকৃতি থেকে যেকোনো বিষয়ে একটি ফ্রি হ্যান্ড ড্রইং স্কেচ কর। কাগজের মাপ– ২৫ X ৩৭ সেমি. মাধ্যম–পেনসিল বা কালি–কলম।

২। একটি বটগাছের গুঁড়ি পেনসিল মাধ্যমে অনুশীলন করে দেখাও। সময়– ৫ ঘণ্টা।

৩। একটি কচুগাছ পেনসিলে অনুশীলন করে দেখাও। সময়– ৫ ঘণ্টা বা একদিন।

৪। একটি নৌকা পেনসিলে ধরে ধরে অনুশীলন করে দেখাও। সময়– ৫ ঘণ্টা বা একদিন।

৫। আমগাছের একটি ডাল, পাতাসহ কালি–কলমে স্টাডি করে দেখাও। সময়– ৫ ঘণ্টা বা একদিন।

৬। তোমার সামনে মাটির পাত্র নিয়ে সাজানো স্থির বিষয়ের অনুশীলন– কাগজের মাপ–২৫ X ৩৭ সেমি.। সময়– ২ দিন।

৭। রঙিন প্যাস্টেল দিয়ে তোমার সামনে সাজানো স্থির বিষয়টি অনুশীলন করে আঁকো। কাগজের মাপ– ২৫ X ৩৭ সেমি.।

৮। জলরং বা পোস্টার রং দিয়ে নিচের যেকোনো বিষয়ে একটি চিত্র রচনা করো। কাগজের মাপ– ৩০ X ৪০ সেমি.। সময়– ৩ দিন।

বিষয়– নদীর ঘাট, জেলে, মোষের পিঠে রাখাল, খাঁচায় টিয়াপাখি, ধানকাটার দৃশ্য, কবি গানের লড়াই, বর্ণমালা ও নকশা।

দশম শ্রেণির জন্য ব্যবহারিক শিল্প, ছবি আঁকা বর্ণমালা শেখা, নকশা, ফ্যাশন ডিজাইন ও ইন্টেরিয়র ডিজাইন

ছবি আঁকা

১। বাস্তব জীবন ও প্রকৃতি থেকে স্কেচ ও ড্রইং ক্লাসের সংখ্যা– ৫টি।

মাধ্যম–পেনসিল, কালি–কলম ও ক্রেয়ন।

উপরের মাধ্যমগুলোতে ছাত্রছাত্রীরা নবম শ্রেণির মতো জীবজন্তু ও মানুষকে বিষয় করে আঁকার চেষ্টা করবে। সেজন্য শিক্ষক ছাত্রদের নিয়ে চিড়িয়াখানা, ব্যস্ত মানুষের স্থান, হাটবাজার, রেলওয়ে স্টেশন, গ্রামে–যেখানে গরু, মোষ বেশি পাওয়া যায় ইত্যাদি স্থানে নিয়ে যাবেন।

উপরের মাধ্যমগুলোতে এবং সম্ভব হলে জলরঙে প্রকৃতির বিভিন্ন বিষয় নিয়ে ছবি আঁকার সাধারণ নিয়মগুলো যথাসম্ভব মেনে অর্থাৎ আলোছায়া, পারসপেকটিভ ইত্যাদি ঠিক রেখে যত বেশি পারা যায় অনুশীলন করতে হবে। যেমন– বিভিন্ন রকম গাছপালা, পশুপাখি ও প্রাকৃতিক দৃশ্য।

আর স্কেচ বই বা খাতায় সব সময় স্কেচ ও ড্রইং অবশ্যই করে যেতে হবে। স্কেচ বই হবে সব সময়ের সঙ্গী।

২। স্থিরচিত্র/ স্টিল লাইফ ক্লাস ৫টি; সম্ভব হলে আরও বেশি। প্রতিটি ক্লাসের সময়– ৩ থেকে ৪ দিন।

শিক্ষক ক্লাসে স্থিরচিত্রের বিষয় সাজিয়ে দেবেন। স্থিরচিত্রের বিষয় নবম শ্রেণির মতো হাঁড়ি–পাতিল, বোতল, বৈয়াম, এসব দিয়েও সাজাতে পারেন। নতুন বিষয় ফলমূল, কলা, পেঁপে এবং তরিতরকারি–লাউ, ঝুমড়া, বেগুন ইত্যাদি দিয়েও সাজাতে পারেন। স্থিরচিত্র সাজাবার সময় লক্ষ রাখতে হবে যে আলোছায়ার প্রতিফলন যেন ঠিকমতো হয়। দশম শ্রেণিতে আগের মতো পেনসিলে ২/১টি ক্লাস করে পরের ক্লাসগুলো অবশ্যই জলরং মাধ্যমে করবে।

৩। চিত্র রচনা বা কম্পোজিশন ক্লাস ৫টি, সময়– ৫ দিন।

শিক্ষক, কীভাবে চিত্র রচনা করতে হয় তা ছাত্রদের বিশদভাবে বুঝিয়ে দেবেন। বইতে চতুর্থ অধ্যায়ে কম্পোজিশন বিষয়ে আলোচনা রয়েছে। ছাত্ররা যে বিষয়ে চিত্র রচনা করবে সেটি আগে কিছু ছোট আকারে খসড়া করে নেবে। অন্তত ৩/৪টি খসড়া থেকে সবচেয়ে সুন্দরটি শিক্ষক বেছে দেবেন। সেটি জলরঙে, পোস্টার রঙে বা প্যাস্টেলে শিক্ষার্থীর ইচ্ছেমতো যেকোনো রঙে আঁকবে। বিষয় গ্রহণ করবে প্রকৃতি থেকে ও জীবনযাপন থেকে। নবম শ্রেণিতে সেই বিষয়গুলোর উল্লেখ রয়েছে।

বর্ণমালা লেখা– ক্লাসের সংখ্যা– ৩টি, সময়– প্রতিটি ক্লাস–৩দিন। নবম শ্রেণি থেকে বর্ণমালা লেখার চর্চা করবে। হাতের লেখা চর্চা করে আরও সুন্দর করবে। কয়েকটি ক্লাস করবে নিচের বিষয়গুলো চর্চা করার জন্য।

(ক) মানপত্র তৈরি, (খ) পোস্টারচিত্র তৈরি, (গ) অনুষ্ঠানের আমন্ত্রণলিপি তৈরি, (ঘ) শুভেচ্ছাপত্র তৈরি। নববর্ষের কার্ড, ঈদ কার্ড, জন্মদিনের কার্ড ইত্যাদি।

নকশা

ক্লাসের সংখ্যা ৩টি। প্রতিটি ক্লাস– ৩ দিন

(ক) বৃত্ত, চতুর্ভুজ, ত্রিভুজ, রেখা ও ফুল–পাতা সমন্বয়ে ইসলামিক ডিজাইন তৈরি করবে। শিক্ষক নকশা তৈরির বিষয়টি বিশদভাবে বুঝিয়ে দেবেন।

(খ) ছাত্ররা নিজেরা ভেবে–চিন্তে কিছু নকশা তৈরি করবে বিভিন্ন কাজে ব্যবহারের জন্য। যেমন– চাদর, পর্দা, ছেটিদের জামা–কাপড়, পাঞ্জাবি, শাড়ি, সোফা, কুশন, টেবিল কাপড় ইত্যাদি।

ফ্যাশন ডিজাইন (Fashion design)

ক্লাসের সংখ্যা– ২টি (প্রতিটি ক্লাস ২ দিন)

শিক্ষার্থী নিজের বা পরিবারের জন্য দুটি পোশাকের নকশা অঙ্কন করবে।

অভ্যন্তরীণ সাজসজ্জা (Interior Decoration)

ক্লাসের সংখ্যা ২টি, প্রতিটি ক্লাস–২দিন। বসার কক্ষ ও শয়ন কক্ষের দুটি করে নকশা অঙ্কন। এক্ষেত্রে ব্যবহৃত আসবাব ও পর্দা এবং দেয়ালের রং এঁকে দেখাবে।

নমুনা প্রশ্ন (ব্যবহারিক)

১। সামনে বাঁধা গরুটির বিভিন্ন দিক থেকে কয়েকটি ফ্রি হ্যান্ড ড্রইং ও স্কেচ কর। সময় – ১ দিন।

২। প্রকৃতি থেকে তোমার ইচ্ছেমতো ১টি ড্রইং ও স্কেচ করে দেখাও। সময় –১ দিন।

৩। একটি আমগাছ বা বাঁশঝাড় পেনসিলে বা কালি-কলমে অনুশীলন করে দেখাও।

৪। একটি কুঁড়েঘর ও তার পরিবেশ পেনসিল বা কালি-কলমে অনুশীলন করে দেখাও। কাগজের মাপ- ২৫ X ৩৭ সেমি., সময়–১ দিন।

৫। তোমার সামনে সাজানো স্থির জীবন চিত্রটি জলরং দিয়ে আঁকো। সময়- ৩ দিন।

৬। সবজি দিয়ে সাজানো স্থির জীবন চিত্রটি প্যাস্টেল রঙে বা জলরঙে আলোছায়ার প্রতিফলনসহ আঁকো। কাগজের মাপ- ২৫ X ৩৭ সেমি., সময়- ৩ দিন।

৭। জলরং বা পোস্টার রঙে নিচের যেকোনো একটি বিষয়ে চিত্র রচনা করো। মূল চিত্রের সাথে চিত্র রচনার খসড়াগুলো জমা দিতে হবে। কাগজের মাপ- ৩০ X ৪০ সেমি. বা ১৫″ X ১৮″, সময়- ৫ দিন। বিষয়- জেলে, তাঁতি, গরুরগাড়ি, কলসি কাঁখে বধূ, পাখি বিক্রেতা, বেদে, পালতোলা নৌকা, নৌকাবাইচ, ধান কাটা, ধান মাড়াই, ফেরিওয়ালা, যেকোনো মেলা, ধান ভানা, পিঠা বানানো, একুশের প্রভাতফেরি, মিছিল, মেলা ও ঈদ। ছাত্রছাত্রীরা নিজেদের ইচ্ছেমতো বিষয় ঠিক করে তা দিয়ে চিত্র রচনা পরীক্ষা দিতে পারে। শিক্ষক সেভাবে প্রশ্ন করতে পারেন।

৬ষ্ঠ অধ্যায়

বাস্তব ও স্মৃতি থেকে অনুশীলন

এ অধ্যায় পাঠ শেষে আমরা–

- স্টিল লাইফ বা স্থির জীবন নিয়ে ছবি আঁকতে পারব।
- মানুষ ও বিভিন্ন প্রাণীর ছবি আঁকতে পারব।
- প্রকৃতি ও পারিপার্শ্বিক জগৎ নিয়ে ছবি আঁকতে পারব।
- স্মৃতি থেকে বিভিন্ন ঘটনা বা বিষয়ভিত্তিক ছবি আঁকতে পারব।
- টাইলস নিয়ে মোজাইক পেইন্টিং করতে পারব।

পাঠ : ১, ২, ৩, ৪, ৫ ও ৬

স্টিল লাইফ ও শিল্পকলা (জড় জীবন)

অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত আমরা দৈনন্দিন ব্যবহার্য নানা প্রকারের বস্তু বা জিনিসের এককভাবে অনুশীলন করেছি। এখন আমরা কতগুলো বস্তু বা জিনিসকে একত্রে সাজালেও যে এটি একটি আলাদা বিষয় হয়ে শিল্পগুণে প্রকাশিত বা উপস্থাপিত হতে পারে তা জানব।

স্থিরচিত্র অঙ্কনে যে বিষয়গুলো আমাদের মনে রাখা প্রয়োজন তা হলো বিষয়বস্তুর আকার-আকৃতির সুসমন্বয় বিষয় নির্বাচন, বিষয় সাজানো সর্বোপরি আলোর দিক নির্দেশনা লক্ষ করে বাস্তবভাবে কীভাবে অঙ্কন করা যায় তা শিক্ষকের সাহায্যে এবং নিম্নের চিত্র থেকে ধারণা নিয়ে তোমরাও মনের মতো বিষয় নির্বাচন করে অনুশীলন করতে পারবে।

পোস্টার রঙে আঁকা স্টিল লাইফ বা স্থিরচিত্র

পাঠ : ৭, ৮, ৯, ১০, ১১ ও ১২

মানুষ ও বিভিন্ন প্রাণীর ছবি আঁকার অনুশীলন

অষ্টম শ্রেণিতে মানুষ ও প্রাণী আঁকার প্রাথমিক অনুশীলন আমরা জেনেছি। এখন আমরা জানব মানুষ আঁকার কিছু কাঠামোগত কৌশল। ছোট শিশু থেকে পূর্ণবয়স্ক একটি মানুষের ছবি আঁকার ক্ষেত্রে কতগুলো মাপজোকের নিয়ম আছে। বয়স ভেদে মানুষের দেহ অবকাঠামোর পরিবর্তন ঘটে। একটি শিশুর ছবি আঁকার পরিমাপকের সাথে একজন পূর্ণবয়স্ক মানুষের ছবি আঁকার পরিমাপকের ভিন্নতা রয়েছে। যেমন– একটি ছোট শিশুর ছবি আঁকার সময় যদি তার মাথার মাপকে

একক করে নেই তাহলে তার সমস্ত শরীর যেমন ৪টি মাপে বিভাজন করা যাবে, তেমনি একজন পূর্ণবয়স্ক মানুষের ক্ষেত্রে কিন্তু সেটা হবে না। তার মাথার মাপ একক করে বিভাজন করলে তা ৭ কিংবা ৮ গুণে ভাগ করা যাবে।

নিম্নের চিত্রে একটা ছকের মাধ্যমে তা দেখানো হলো।

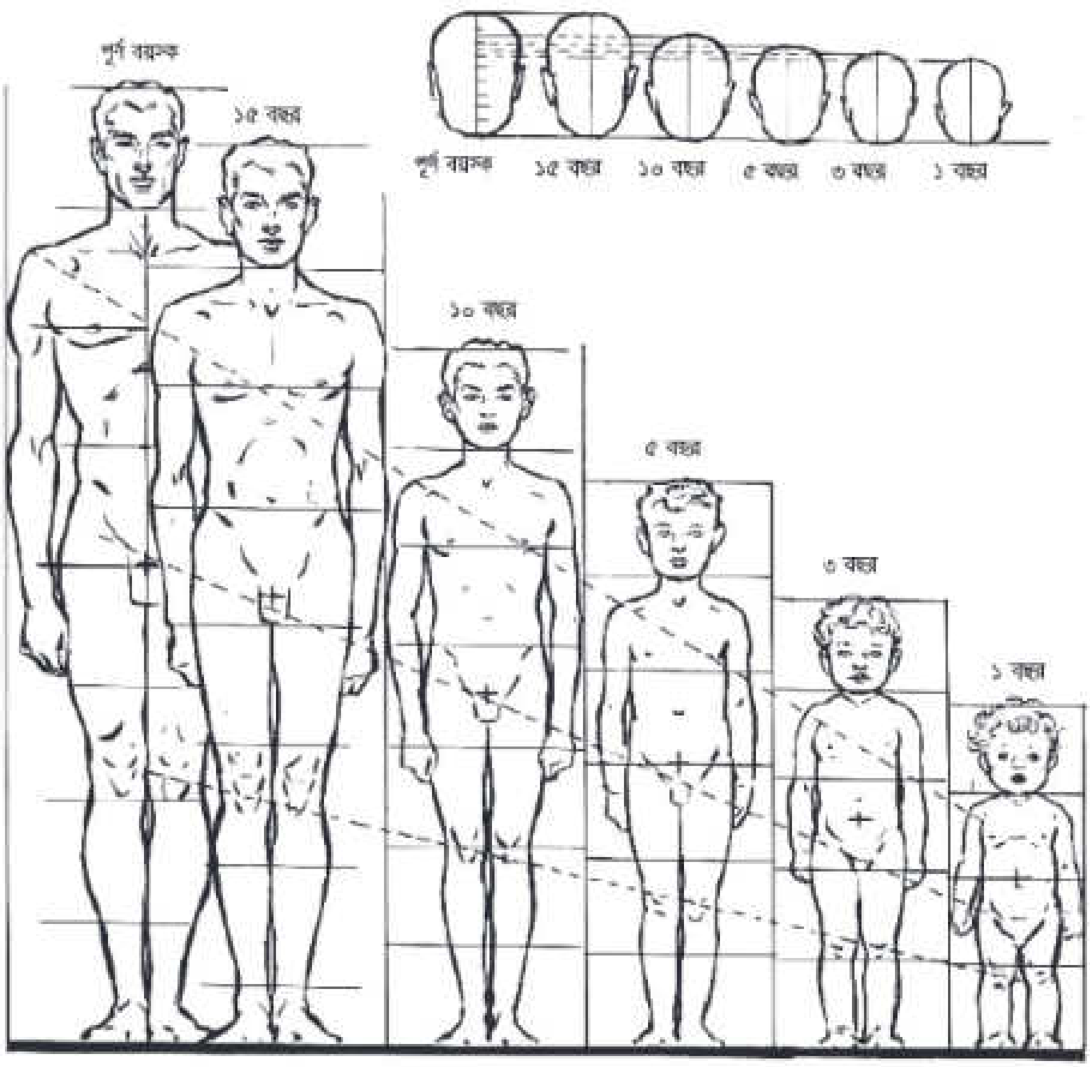

বিভিন্ন বয়সে মানুষের দৈহিক গঠনের পরিবর্তন

শিক্ষকের সহযোগিতা নিয়ে তোমরা অনুশীলন করলে এ বিষয়ে আরও দক্ষতা নিজেরাই অর্জন করতে পারবে। তাছাড়া মানুষের গতি–প্রকৃতির ওপর একটু গভীরভাবে দৃষ্টিপাত করলে পূর্বে অর্জিত জ্ঞানের সমন্বয় করে তোমরা তোমাদের অঙ্কিত ছবিতে মানুষের সাথে কোনো প্রাণীর ছবি সংযোজন করে আরও প্রাণবন্ত করে তুলতে পারবে।

পাঠ : ১৩, ১৪, ১৫, ১৬, ১৭, ১৮ ও ১৯

প্রকৃতি থেকে অনুশীলন

আমরা এতদিন স্মৃতিনির্ভর ছবি এঁকেছি। এখন আমরা বাস্তবের একটা ছবি কীভাবে আঁকা যাবে, সে বিষয়ে জানব। আমরা যে যেখানেই থাকি না কেন তার চারপাশে প্রাকৃতিক পরিবেশ আছে। তোমার পারিপার্শ্বিকতার যে দৃশ্যটি তোমার বেশি ভালো লাগে– কোনো এক ছুটির দিনে সেখানে কাগজ, বোর্ড, পেনসিল নিয়ে একটা নির্দিষ্ট দূরত্বে বসে ছবি আঁকার সাধারণ নিয়মের আলোকে এবং শিক্ষকের সহায়তা নিয়ে কাজ শুরু করে দিবে। এখানে যে বিষয়টি বেশি গুরুত্ব দিতে হবে তা হলো তোমার কাগজে বা ক্যানভাসে তোমার নির্বাচিত বিষয়ের কোন অংশটুকু থাকবে তা মনে মনে ভেবে নিবে। আরও একটি বিষয়ের দিক খেয়াল রাখতে হবে তা হলো– তুমি যে সময় ছবিটি আঁকবে সেই সময়ের আলোর নির্দেশনা, যেমন– তুমি যদি সকাল নয়টায় ছবিটি আঁক তাহলে সূর্যের আলো পূর্ব দিকে থাকবে পশ্চিম দিকে ছায়া পড়বে। আবার বারোটার পর দুইটা কিংবা তিনটার সময় যদি তুমি ছবিটি আঁক তাহলে আলো পশ্চিম দিক থেকে আসবে এবং পূর্ব দিকে ছায়া পরবে। প্রকৃতির সাথে আলোছায়ার যে নিবিড় সম্পর্ক তা জেনে তুমি যখন ছবি আঁকবে তখন তোমার ছবিই বলে দিবে এটা কোন সময়ে এঁকেছ। প্রাকৃতিক দৃশ্য বা যেকোনো ছবি আঁকার সময় এ ব্যাপারটি মনে রাখতে হবে।

পেনসিলে আঁকা প্রাকৃতিক দৃশ্য

পাঠ : ২০, ২১, ২২, ২৩, ২৪ ও ২৫

স্মৃতি থেকে অনুশীলন

আজকে যা কিছু আমরা বাস্তবে অবলোকন করি আগামীকাল তা হয়ে যায় স্মৃতি। আমাদের জীবনে অনেক ঘটনা আছে যা স্মৃতিতে অমলিন হয়ে আছে। কোনো কোনো স্মৃতি থাকে মধুর আবার অনেক স্মৃতি থাকে বেদনার। সেসব স্মৃতিনির্ভর ছবি আঁকতে গেলে আমাদের ফিরে যেতে হয় সেই সময়ে। চোখ বুঝলেই দৃশ্যাকয়ে ভেসে ওঠে ঘটনার হুবহু বর্ণনা। একটু গভীরভাবে উপলব্ধি করে আমরা সেসব ঘটনার বর্ণনা নিয়েও ছবি আঁকতে পারি। যেমন– বার্ষিক পরীক্ষার পর বিদ্যালয় থেকে তোমাদের শ্রেণির সব বন্ধু শিক্ষকদের নিয়ে দূরে কোনো মনোরম পরিবেশে শিক্ষা সফরে গেলে। সেখানকার প্রকৃতি, পরিবেশ, দর্শনীয় স্থানগুলো সকলে মিলে উপভোগ করেছ। যা এখন তোমার মনের মাঝে গেঁথে আছে। গভীরভাবে ইচ্ছা করলে তুমি সে স্থান, প্রাকৃতিক পরিবেশ ইত্যাদি নিয়ে একটা মজার ছবি এঁকে ফেলতে পার। তেমনিভাবে তোমার স্মৃতিবিজড়িত যেকোনো ঘটনা নিয়েও ছবি আঁকতে পার।

পাঠ : ২৬, ২৭, ২৮, ২৯ ও ৩০

মোজাইক পেইন্টিং (Mosaic Painting)/দেওয়ালচিত্র বা ম্যুরাল (Mural)

ম্যুরাল শিল্প হিসেবে অত্যন্ত প্রাচীন। সাধারণত পাবলিক প্লেস বা জন সমাগম হয় এ রকম স্থানে, কোনো ভবন বা দেয়ালে বড় আকারের যে ছবি করা হয়, তাকে ম্যুরাল বলে। বড়ো বড়ো হোটেল, রেস্তোরাঁ, অফিস ভবন, স্কুল, কলেজ, বিভিন্ন রাষ্ট্রীয় গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনাতে ম্যুরাল হয়ে থাকে। গ্লেজ টাইলসে নির্মিত হয় বলে রোদ, বৃষ্টি, ঝড়, ধুলাবালি ও অন্যান্য প্রতিকূল আবহাওয়ার সাথে পাল্লা দিয়ে ম্যুরাল টিকে থাকতে পারে। সেজন্য খোলা জায়গায় বা ভবনের বাইরের দেয়ালে ম্যুরাল নির্মাণ করা হয়। ম্যুরালকে মোজাইক চিত্র বা Mosaic Painting ও বলা হয়।

নানা রঙের গ্লেজ টাইলস দোকানেই কিনতে পাওয়া যায়। আমরা দেয়ালে লাগানোর জন্য যেসব টাইলস ব্যবহার করি চিত্রের প্রয়োজন অনুযায়ী বিভিন্ন রং নির্বাচন করে সেসব টাইলস দিয়েই মোজাইক চিত্র বা ম্যুরাল নির্মাণ করা যায়। তবেছোটো ছোটো রঙিন পাথরের টাইলসের এবং কাচের টুকরা বা নানা ধরনের সিরামিক পাত্রের ভাঙা টুকরা দিয়েও মোজাইক চিত্র করা সম্ভব।

রঙিন টাইলস ভেঙে মোজাইক ছবি

নির্মাণ পদ্ধতি

মুরালের জন্য প্রথমে নির্ধারিত ছবির ছোটো লে-আউটকে প্রয়োজন অনুযায়ী বড়ো করে নিতে হবে। অর্থাৎ ছোটো আকারের ছবিটিকে যে জায়গায় মুরাল তৈরি হবে সে জায়গার মাপ অনুযায়ী আনুপাতিক হারে বড়ো করে নিতে হবে। নকশা বা ছবিটি মাপমতো কাগজে বা রেক্সিন পেপারে রং দিয়ে এঁকে নিতে হবে। পরে ঐ কাগজ বা রেক্সিন (আজকাল ছোটো ছবি বা লে-আউটকে ডিজিটাল প্রিন্টের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় মাপে বড়ো করা হয়) মেঝেতে বিছিয়ে নিতে হবে। এবার নকশা বা ছবির রং অনুযায়ী রঙিন টাইলসের ছোটো ছোটো টুকরা উল্টোপিঠ নিচে এবং রঙিন পিঠ উপরে রেখে ছবির ওপর বসিয়ে নিতে হবে। পুরো ছবিতে রঙিন টুকরা টাইলস সাজিয়ে দিলে কাগজে রেক্সিনে অঙ্কিত ছবি অনুযায়ী রঙিন মুরালচিত্র সম্পন্ন হবে। এরপর ভালোভাবে ছবিটি পর্যবেক্ষণ করে প্রয়োজনীয় সংশোধন করে উপরের ধুলাবালি ও অন্যান্য ময়লা বাতাস দিয়ে পরিষ্কার করতে হবে। তারপর একটু মোটা কাগজে ময়দার আঠা মেখে সাবধানে সেই কাগজ সাজানো টাইলসের ওপর বসিয়ে আস্তে আস্তে চাপ দিয়ে লাগিয়ে নিতে হবে। আঠা শুকানোর পর ছোটো ছোটো অংশে ছবিটিকে ভাগ করে দাগ দিয়ে নিতে হবে। ভাগগুলোর ক্রম বা সিরিয়াল যাতে ঠিক থাকে সেজন্য এতে নম্বর বা চিহ্ন দিতে হবে। তারপর দাগ অনুযায়ী কাগজসহ ছবিটিকে ছোটো ছোটো টুকরা অংশে কেটে নিতে হবে। সুন্দরভাবে প্যাকেট করে যে স্থানে বা দেয়ালে মুরাল তৈরি হবে, সেখানে নিয়ে যেতে হবে তারপর দেয়ালে সিমেন্টের আস্তর দিয়ে তার ওপর স্ল্যাব বা কাটা অংশগুলো পূর্বের ক্রম অনুযায়ী বসিয়ে দিতে হবে। এমনভাবে বসাতে হবে যাতে কাগজের দিকটা ওপরে থাকে। সমস্ত অংশে সিমেন্ট লাগিয়ে শুকানো পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে। শুকানোর পর পানি দিয়ে কাগজ ভিজিয়ে আস্তে আস্তে সম্পূর্ণ কাগজ তুলে ফেলতে হবে, তা হলেই প্রয়োজনীয় মুরালচিত্রটি পাওয়া যাবে। কাগজ তোলা শেষ হলে ছবিটি ভালোভাবে পানি ও গুঁড়া সাবান দিয়ে পরিষ্কার করে দিতে হবে। প্রয়োজনে সাদা সিমেন্টের সাথে রঙিন অক্সাইড মিশিয়ে পুটিং করা যেতে পারে।

নমুনা প্রশ্ন

ব্যবহারিক

১. স্থিরচিত্র (still life) অঙ্কনের কোন কোন বিষয়গুলোর প্রতি বেশি মনে রাখা প্রয়োজন?

২. বাস্তব ছবি অঙ্কনের সময় যে বিষয়গুলো গুরুত্ব দেওয়া প্রয়োজন তা তোমার আউটডোরের একটি ছবি আঁকার মাধ্যমে বর্ণনা করো।

৩. বয়স ভেদে মানুষের দৈহিক আকার-আকৃতির পরিমাপের যে ভিন্নতা তা অঙ্কনের মাধ্যমে তুলে ধরো।

৪. মোজাইক পেইন্টিং (Mosaic Painting) নির্মাণের কৌশলগুলো ধারাবাহিকভাবে বর্ণনা করো।

সপ্তম অধ্যায়

কারুকলা

এই অধ্যায় শেষে আমরা–

বাঁশ ও বেতের কাজ

- বাঁশ দিয়ে বিভিন্ন শিল্পকর্ম তৈরি করতে পারব। যেমন– পুতুল, ফুলদানি, ছাইদানি, কলমদানি ইত্যাদি। বাঁশের চালন, ঝুড়ি, খালই, বাঁশের চাটাই ইত্যাদি তৈরি করতে পারব।
- বেতের সাধারণ পাটি ও নকশি পাটি তৈরি করতে পারব।
- ছোটো ছোটো খালই, ঝুড়ি তৈরি করে ঘর সাজাতে পারব।

কাপড় ছাপা

- রঙের নামগুলো জানব।
- কাপড়কে রংকরণ ও ছাপার জন্য উপযোগী করে তৈরি করতে পারব।
- কাপড় রং করার পদ্ধতি বর্ণনা করতে পারব।
- ব্লক তৈরি করতে পারব, ব্লক দিয়ে কাপড়ে ছাপ দিতে পারব।
- টাইডাই পদ্ধতিতে কাপড় ছাপার কাজ করতে পারব।
- মোম বাটিক পদ্ধতিতে কাপড় ছাপতে পারব।
- কাঠ কেটে বিভিন্ন শিল্পকর্ম করতে পারব।

ফেলনা জিনিস দিয়ে শিল্পকর্ম

- ভাঙা হাঁড়ি–পাতিল দিয়ে বিভিন্ন রকম শিল্পকর্ম তৈরি করতে পারব।
- ফেলনা তার দিয়ে শিল্পকর্ম তৈরি করতে পারব।
- এই শিল্পকর্ম দিয়ে নিজের ঘর সাজাতে পারব।
- মাটির স্ল্যাব দিয়ে শিল্পকর্ম (টেরাকোটা) তৈরি করতে পারব।

পাঠ : ১

বাঁশ ও বেতের কাজ

বাঁশ আমরা সবাই দেখেছি। আমাদের দেশে নানা প্রকার বাঁশ পাওয়া যায়। যেমন–বরাক, মাখাল, জাই, মুলি, চিকন প্রভৃতি। দেশের ভিন্ন ভিন্ন জায়গায় একই বাঁশ হয়তো ভিন্ন ভিন্ন নামে পরিচিত। যেমন– বরাক সিলেটে বড়ুয়া এবং নোয়াখালীতে বরো নামেও পরিচিত। মাখাল বাঁশকে কোথাও বাকাল আবার মুলিকে কোথাও বা বেতো বাঁশ বলা হয়।

বেত আমাদের কাছে পরিচিত। মোটা ও সরু, সাধারণত দুই ধরনের বেত সচরাচর আমরা দেখে থাকি। মোটা লম্বা বেত, গোল্লা বেত এবং চিকন বেত জালি–বেত নামে পরিচিত। এই বাঁশ ও বেত দিয়ে ঘর–দরজা, চেয়ার–টেবিল, আলনা, দোলনা, ডালা, কুলো, খেলনা এবং আরো কত সুন্দর জিনিস যে তৈরি করা যায় তা বলে শেষ করা যায় না।

কিন্তু সব বাঁশ দিয়ে সব কাজ হয় না। সব বেত দিয়েও না। যে কাজের জন্য যে বাঁশ সবচেয়ে বেশি উপযোগী সে কাজে সে বাঁশই ব্যবহার করতে হয়। বেতের বেলায়ও তাই কাঠামোর জন্য ব্যবহার করতে হয় গোল্লা বেত আর বাঁধন নকশা ও বুননের জন্য জালি বেত। এ হলো সাধারণ নিয়ম। তাই কোনো জিনিস তৈরি করতে গেলে ঐ কাজের উপযোগী প্রয়োজনীয় বাঁশ–বেত সংগ্রহ করে নেব। কিন্তু সব সময়ই তো আর ইচ্ছেমতো সব জিনিস পাওয়া যায় না। হাতের কাছে যখন যে জিনিস পাব তা দিয়েই সবচাইতে কম খাটুনিতে সব চেয়ে সুন্দর কী জিনিস তৈরি করা যায় তা চিন্তা করব। একখণ্ড বাঁশ পেলে সেটা ভালো করে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখব ও চিন্তা করব এ দিয়ে কী তৈরি করা যায়। ফুলদানি, ট্রে, ডালা, কুলো, ঝুড়ি, নৌকা, পুতুল, বাঁশি না অন্য কোনো কিছু?

উপকরণ

কোনো জিনিস তৈরি করতে গেলে বাঁশ, বেত ছাড়াও যন্ত্রপাতি ও আরো কিছু জিনিসপত্রের প্রয়োজন হয়। যেমন– ধারালো দা, ছুরি, করাত, হাতুড়ি, বাটাল, তুরপুন, শিরীষ কাগজ ভাঙা কাচের টুকরা, ছোটো-বড়ো, তারকাটা এবং বাঁশ-বেত ও কাঠ জোড়া দেওয়ার উপযোগী শক্ত আঠা ইত্যাদি। যারা আমরা শহরে বাস করি সহজেই গেদিগাম, আইকা, অ্যাক্রেলিক এসব উন্নতমানের বিদেশে তৈরি আঠা সংগ্রহ করে নিতে পারি। কিন্তু মফস্বলের ছাত্রছাত্রীদের পক্ষে তা সম্ভব নয়। তাই সহজলভ্য ও বেশ শক্ত আঠা তৈরির একটি পদ্ধতি এখানে জেনে নিই।

ময়দার সাথে পানি মিশিয়ে রুটি তৈরির উপযোগী একটি পিণ্ড বা গোলা তৈরি করি। এক টুকরা পাতলা কাপড়ে ঐ পিণ্ডটি ভালো করে বেঁধে নিয়ে গামলায় পানিতে, হাতের মুঠোয় চেপে চেপে ধুতে থাকি। গামলার পানি মাঝে মাঝে বদলাব এবং যতক্ষণ ঐ পিণ্ড থেকে ময়দা ধোয়ার সাদা পানি বের হবে ততক্ষণ পর্যন্ত ধোবো। ধোয়া শেষ হলে দেখব কাপড়ের বাঁধনে ছানার মতো নরম কিছু জিনিস জমে আছে। একটি পাত্রে তা যত্ন করে তুলে রাখি। এর সাথে সামান্য কিছু পান খাওয়ার চুন খুব ভালো করে মেশালেই খুব ভালো আঠা তৈরি হবে। চুন মেশানোর কিছুক্ষণের মধ্যেই আঠা ব্যবহার করতে হবে তা না হলে শক্ত হয়ে যাবে। চুন না মেশালে ছানার মতো অবস্থায় এই আঠা দুদিন পর্যন্ত রাখা যায়। বাঁশ ও বেত দিয়ে কেমন করে কী জিনিস তৈরি করা যায় এবার জেনে নিই।

পাঠ : ২ ও ৩

ফুলদানি

বাঁশ দিয়ে খুব সহজে ফুলদানি তৈরি করা যায়। ফুলদানির জন্য মোটা ফাঁপা বরাক বাঁশের প্রয়োজন। বাঁশ যেন পাকা ও

শুকনো হয়। লক্ষ রাখব বাঁশের গায়ে যেন কোনো ফাটল না থাকে, পোকায় কাটা না হয়। বাঁশের গিটগুলো ধারালো দা দিয়ে চেঁছে সমান করে নেব যেন হাতে না লাগে। করাত দিয়ে খুব সাবধানে গিটের এক বা দেড় ইঞ্চি নিচে কেটে নেব। লক্ষ রাখব যেন গিট কেটে ছিদ্র না হয়ে যায়। বাঁশ যেমন মোটা তার সাথে মিল রেখে ফুলদানির উচ্চতা ঠিক করতে হবে। বাঁশের ব্যাস মেপে নিয়ে তার দ্বিগুণ উচ্চতা রাখলে মানানসই হয়। ভালো লাগলে এর চেয়ে লম্বা করেও কাটতে পারি। উচ্চতা ঠিক করে খুব সাবধানে করাত দিয়ে কেটে নিই। খেয়াল রাখব কাটার সময় যেন ফেটে না যায়। এই তো মোটামুটিভাবে একটা ফুলদানি তৈরি হলো। শিরীষ কাগজ দিয়ে ঘষে ফুলদানির মুখ ও তলা মসৃণ করে নিই। এবার এটাকে কত বেশি সুন্দর করা যায় তা ভেবে চিহ্নিত করতে হবে। বাঁশের উপরের মসৃণ অংশ চেঁছে তুলে দিলে ভেতর থেকে লম্বালম্বি আঁশের সুন্দর স্তর বের হয়। স্বাভাবিক মসৃণ অংশ ও চাঁছা অংশের মধ্যে রঙেরও তারতম্য হয়। এই তারতম্যকে ফুলদানির গায়ে নকশা করার কাজে লাগানো যায়। চাঁছা অংশ অবশ্যই শিরীষ কাগজ দিয়ে ঘষে মসৃণ করে নেব। এভাবে পছন্দমতো নকশা করার পর ফুলদানির ভিতরে ও বাইরে কোপাল বার্নিশের চকচকে প্রলেপ দিয়ে নেব। অন্যান্য পদ্ধতিতেও নকশা করা যায়। বাঁশের স্বাভাবিক মসৃণ পিঠ সম্পূর্ণরূপে চেঁছে তুলে ফেলে শিরীষ কাগজে ঘষে পলিশ করে নিয়ে এনামেল বা অন্য কোনো রং দিয়ে পছন্দমতো নকশা করব। ঐ রং শুকিয়ে যাওয়ার পর ফুলদানির ভিতরে ও বাইরে কোপাল বার্নিশের প্রলেপ দিয়ে নেব। বার্নিশে জিনিসটি যেমন চকচকে হয় তেমনি পোকায় কাটারও ভয় থাকে না।

উপরে দেয়া একই নিয়মে পেনসিল ও কলম রাখার পাত্র, ছাইদানি, গ্লাস ইত্যাদি তৈরি করা যেতে পারে। ছাইদানির উচ্চতা পরিমাণমতো কমিয়ে নেব, গ্লাসের মুখ ভেতর থেকে চেঁছে পাতলা করতে হবে আর নিচের দিকটা চেঁছে সরু করে দিলে সুন্দর দেখাবে। পেনসিল ও কলম রাখার পাত্র এবং গ্লাসের জন্য অপেক্ষাকৃত সরু পাতলা বাঁশ ব্যবহার করব। মুলি বা বেতো বাঁশের গোড়ার দিকটা এ কাজের জন্য উপযোগী। ছাইদানির জন্য মোটা ও পুরু বাঁশের প্রয়োজন। নিচের ছবিতে ফুলদানি, পেনসিল ও কলম রাখার পাত্র, গ্লাস ছাইদানি প্রভৃতির কিছু নমুনা আছে। এমনি করে বাঁশ কেটে ও ছেঁটে আরো বিভিন্ন নকশায় ফেলে বিভিন্ন গড়ন ও গঠনের জিনিস তৈরি করতে পারি।

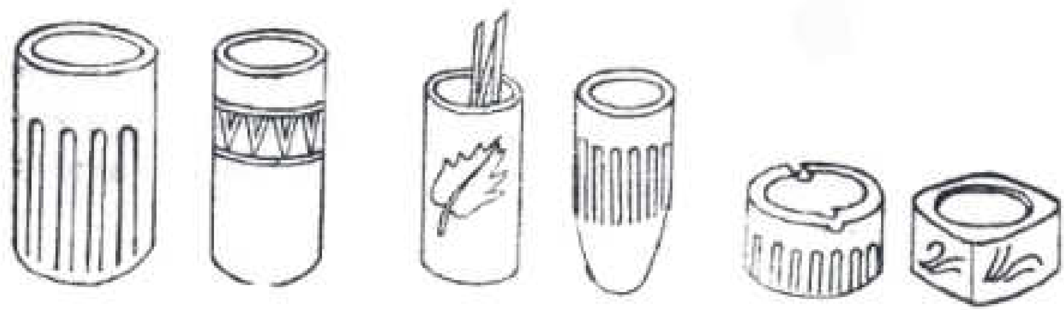

বাঁশের তৈরি নানা রকম ফুলদানি, কলমদানি, ছাইদানি

উপরে আলোচিত জিনিসগুলো তৈরি করতে বাঁশ চেরা অথবা ছিলার প্রয়োজন হয় না। শুধু কেটে নিলেই হলো। এবার যে সব জিনিসের কথা জানব, সেগুলো তৈরি করতে হলে বাঁশ চেরা ও ছিলার প্রয়োজন হবে। তাই আগেই এ সম্পর্কে কিছু জেনে নিই। বাঁশকে চিরে ও ছিলে ব্যবহারের উপযোগী ও আকৃতির প্রকারভেদে মোটামুটিভাবে চার ভাগে ভাগ করা যায়। যেমন– চটা, শলা, বেতি ও পাতি।

পাঠ : ৪, ৫ ও ৬

চটা : বাঁশের লম্বালম্বিভাবে চিরে চেঁছে কিছুটা মসৃণ করে নিলেই বাঁশের চটা তৈরি হয়। শলা সাধারণত দেখতে গোল এবং লম্বা। প্রয়োজনবোধে শলা খুবই সরু করা যায়। প্রয়োজনমতো লম্বালম্বি করা যায়, তবে দুই-তিন হাতের বেশি নয়। শলা তৈরির জন্য মাখাল বা বাকাল বাঁশের প্রয়োজন। বাস্কেট, মাছ ধরার সরঞ্জাম, দোলনা প্রভৃতি বিভিন্ন জিনিস তৈরি করতে শলা ব্যবহার করা হয়।

বেতি : মুলি বা বেতো বাঁশ দিয়ে বেতি তৈরি করতে হয়। প্রথমত চটা তৈরি করে বুকের দিকটা ভালো করে চেঁছে ফেলে দিয়ে বেতি সরু করে চিরে ও ছিলে কিছুটা মসৃণ করে নিতে হয়। বেতি সাধারণত চারকোণ বিশিষ্ট, চওড়া ও সরু কোনো কোনো ক্ষেত্রে বেতি পুরুর চেয়ে চওড়া কিছুটা বেশি হয়। টুকরি, খালই, মাছ ধরার সরঞ্জাম প্রভৃতি তৈরি করতে বেতির প্রয়োজন।

পাতি : পাতি তৈরির জন্য মুলি বা বেতো বাঁশের একান্ত প্রয়োজন। বাঁশের পিঠ ও বুকের মাঝামাঝি অংশটুকু খুব সাবধানে পরতের পর পরত ছিলে নিয়ে পাতি তৈরি করতে হয়। কাঁচা বাঁশ থেকে পাতি ছিলা সহজ, তবে কোনো কিছু বোনার আগে ঐ পাতি ভালো করে শুকিয়ে নিতে হবে। শুকনো বাঁশ দিয়ে পাতি তৈরি করা খুবই কঠিন। পাতি ছিলার আগে শুকনো বাঁশ দুই-তিন দিন পানিতে ভিজিয়ে রাখব। পাতির আকৃতি চ্যাপ্টা এবং পাতলা, এক সুতা থেকে ইঞ্চি খানেক চওড়া এবং প্রয়োজন অনুযায়ী লম্বা। সূক্ষ্ম ও খুব পাতলা পাতি এক হাত দেড় হাতের বেশি লম্বা রাখা যায় না। কুলো, ডালা, চালনি, পাখা ও অন্যান্য জিনিস বুনন এর কাজে পাতি ব্যবহার হয়।

বাঁশের চটা দিয়ে আমরা নানাপ্রকার প্রয়োজনীয় ও সুন্দর জিনিস তৈরি করতে পারি। যেমন– কাগজ কাটার ছুরি, খাওয়ার টেবিলের ছুরি, চামচ, কাটা ইত্যাদি। বাঁশের চটা দিয়ে নৌকাও তৈরি করতে পারি।

কাগজ কাটার ছুরি

এ দুটি জিনিস তৈরি করার একই নিয়ম। এগুলোর আকৃতিতে শুধু সামান্য ব্যবধান। ইঞ্চি খানেক চওড়া ও আট/নয় ইঞ্চি লম্বা পাকা বাঁশের চটা নিই। বুকের দিকের নরম অংশটা ফেলে দিয়ে চেঁছে প্রয়োজনমতো পাতলা করি। পিঠেরদিকটাও সামান্য চেঁছে নিই যাতে বাঁশের আঁশ দেখা যায়। ছুরির বাটের দিকটা যেন অপেক্ষাকৃত পুরু থাকে। খুব সাবধানে ধীরে ধীরে ছবির আকৃতির অনুকরণে কাটি। কাগজ কাটার ছুরির দুদিক এবং খাবার টেবিলের ছুরির আরেক দিক ধারালো করে নিই। এবার ভাঙা কাচের টুকরা দিয়ে একটু চেঁছে খুব মিহি শিরীষ কাগজ দিয়ে ঘষে খুব মসৃণ করি এবং কোপাল ভার্নিশের প্রলেপ দিই।

পুতুল

বাঁশ দিয়ে সুন্দর সুন্দর পুতুলও তৈরি করা যায়। পুতুলের জন্য এক ইঞ্চি থেকে আড়াই ইঞ্চি ব্যাসের পুরু বাঁশের প্রয়োজন। ভিতরের ছিদ্র যেন খুব ছোটো হয়। চিকন বাঁশের গোড়ার দিকটাই উপযোগী। বাঁশের ব্যাস যত বেশি হবে

২০২৫

পুতুলের উচ্চতা তত বাড়বে। নিচের ছবিতে দুই ধরনের পুতুল তৈরির বিভিন্ন স্তর পরপর দেখে নিই। ছবি দেখি এবং সে অনুযায়ী পুতুল দুটি তৈরি করি। মাথার চুলের জন্য খুব মসৃণ ও পাতলা করে বাঁশের পাতি ছিলে নিই। পাতিগুলোর মাথা পেনসিল অথবা আরো সরু কোনো কিছুতে পেঁচিয়ে পাতি ছিলে নিই। পাতিগুলোর মাথা পেনসিল অথবা আরো সরু কোনো কিছুতে পেঁচিয়ে আগুনের আঁচ দিলেই সব সময় বাঁকা থাকবে। পুতুলের হাতগুলো বাঁশের কাঠি দিয়ে তৈরি করি। পুতুলের চুল ও হাত আঠা দিয়ে লাগাব। চুল লাগানোর আগেই মিহি শিরীষ কাগজে ঘষে পুতুলটি মসৃণ করে নিই। চুল লাগানোর পর ভার্নিশের প্রলেপ দেব। ভার্নিশ পুরোপুরি শুকিয়ে গেলে এনামেল রং দিয়ে হালকা করে চোখ, মুখ আঁকব, নাকের চিহ্ন দেব এবং কাপড়-চোপড় বুঝাবার জন্য ছবি আঁকব, নকশা করব ও মাথার চুলগুলো কালো করে দেব।

বাঁশ দিয়ে বিভিন্ন রকমের তৈরি পুতুল

নানা রকম শখের জিনিস ছাড়াও আমাদের দৈনন্দিন জীবনে বাঁশ বেতের জিনিসের ব্যবহার খুবই বেশি। ডালা, কুলো, চালনি, টুকরি, খালুই, মাছ ধরার বিভিন্ন সরঞ্জাম ছাড়া আমাদের কৃষিনির্ভর সমাজ অচল। উপরোক্ত জিনিসগুলো তৈরি করার জন্য প্রথমে বুনন শেখা প্রয়োজন। বহু ধরনের বুনন আছে, বুনে বুনে সুন্দর সুন্দর নকশাও তোলা যায়। সাধারণত একধারা, দুধারা ও তেধারা বুননের প্রচলন খুব বেশি। সমতলভাবে যেমন বোনা যায় তেমনি কুণ্ডলী পাকিয়ে ক্রমাগত বুনে নিচ থেকে উপরে ওঠা যায়। প্রয়োজনবোধে ওপর থেকে নিচেও নামা যায়। কুণ্ডলী পাকানো বুনায় ও একধারা, দুধারা ও তেধারা পদ্ধতি প্রচলিত। হাতপাখা কিংবা কোনোশৌখিন জিনিসের মধ্যে বুনে নকশা তোলার জন্য রঙিন পাতি ব্যবহার করা হয় এবং নকশার প্রয়োজনে একধারা, দুধারা, তেধারা প্রভৃতি বুননের সমন্বয় করা যায়। ছবিতে পরপর একধারা, দুধারা, তেধারা কুণ্ডলী পাকানো ও নকশা বুননের নমুনা দেখে নিই। এবার নিত্য প্রয়োজনীয় কিছু জিনিস তৈরির পদ্ধতি জেনে নিই।

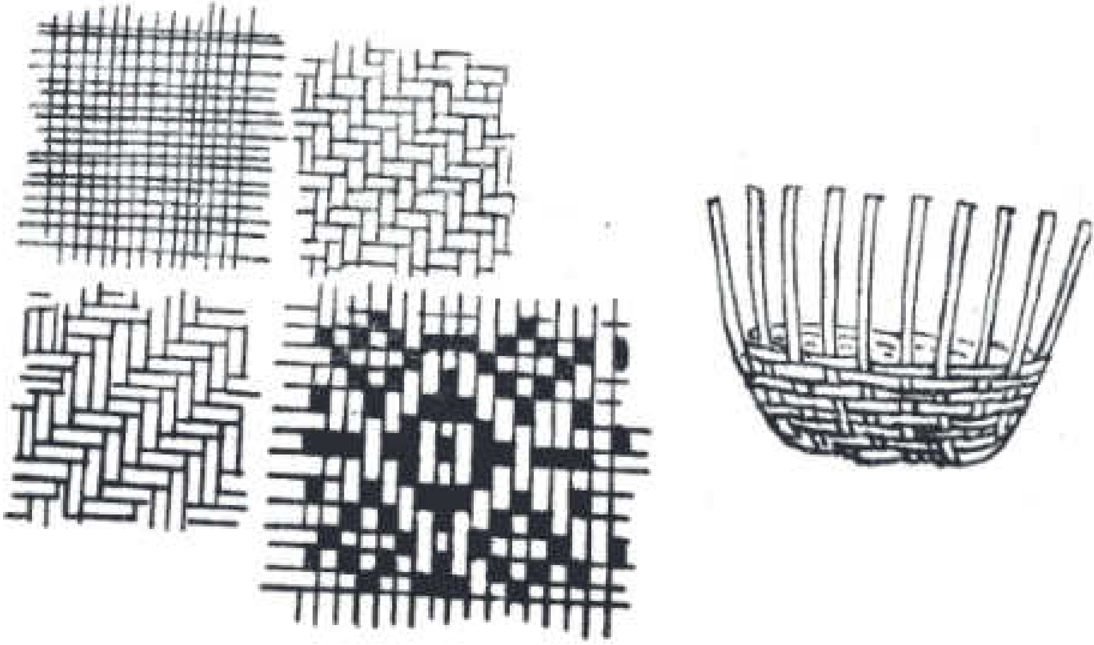

বাঁশের পাতি দিয়ে বিভিন্ন জিনিস তৈরি করার পদ্ধতি

পাঠ : ৭, ৮ ও ৯

ডালা ও চালনি

ডালা ও চালনি তৈরির পদ্ধতি একই রকম। ডালার জন্য আধা ইঞ্চি চওড়া এবং চালনির জন্য এক সুতা বা দেড় সুতা চওড়া পাতলা বাঁশের পাতি নিই। পাতিগুলো হবে বিশ একুশ ইঞ্চি লম্বা। দুটো জিনিসই সাধারণত দুধরা পদ্ধতিতে বুনতে হবে। ডালা বুনতে হবে ঠাস বুননি দিয়ে, যেন কোনো ছিদ্র না থাকে আর চালনি বুনব পাতিতে, দরকারমতো ফাঁক রেখে। খেয়াল রাখব লম্বালম্বি ও আড়াআড়ি উভয় দিকে পাতিতে পাতিতে যেন সমান ফাঁক থাকে। বুনা শেষ হলে চাক বা ফ্রেম লাগাতে হবে। চাকের জন্য এক থেকে দেড় ইঞ্চি চওড়া, সাড়ে তিন হাত লম্বা পাতলা বাঁশের চটা নিয়ে ভালো করে চেঁছে বুকের দিকটা সমান করে নিই। প্রত্যেকটি ডালা বা চালুনের জন্য এরকম একজোড়া চটার প্রয়োজন। চটাগুলোর দুমাথা ছয় সাত ইঞ্চি জায়গা চেঁছে ক্রমে ক্রমে পাতলা করে দুই দিকে যথাসম্ভব পাতলা করে নিই। প্রত্যেকটি চটার এক মাথা পিঠের দিকে এবং অপর মাথা পেটের দিকে চাঁছতে হবে। চাঁছা শেষ হলে একটি চটার পিঠ বাইরের দিকে রেখে আস্তে আস্তে বাঁকিয়ে গোল করে নিই এবং এক হাত ব্যাস রেখে সরু করে চেরাগুলো বেত দিয়ে বেঁধে একটি চাক তৈরি করি। দ্বিতীয় চটার বুক বাইরের দিকে রেখে এভাবে আরো একটি চাক তৈরি করি। প্রথম চাকের চেয়ে দ্বিতীয় চাকের ব্যাস পোয়া ইঞ্চি কম হবে। ডালা অথবা চালনির বুনানো অংশটি যথাসম্ভব বড় রেখে গোল করে কাটি এবং চারদিকে সমান জায়গা রেখে বড়ো চাকের উপর বসিয়ে তাতে চেপে চাকের ভেতর কিছুটা নামিয়ে নিই। এবার ছোটো চাকটি বড়ো চাকের ঠিক মাঝখানে এবং চেপে দেওয়া বুনানো অংশের উপর বসিয়ে জোরে চেপে চেপে বসিয়ে নিই। ছোটো চাক বসাবার সময় খেয়াল রাখব এর জোড়া যেন বাইরের বড়ো চাকের জোড়ার উল্টোদিকে পড়ে।

১০৩৫

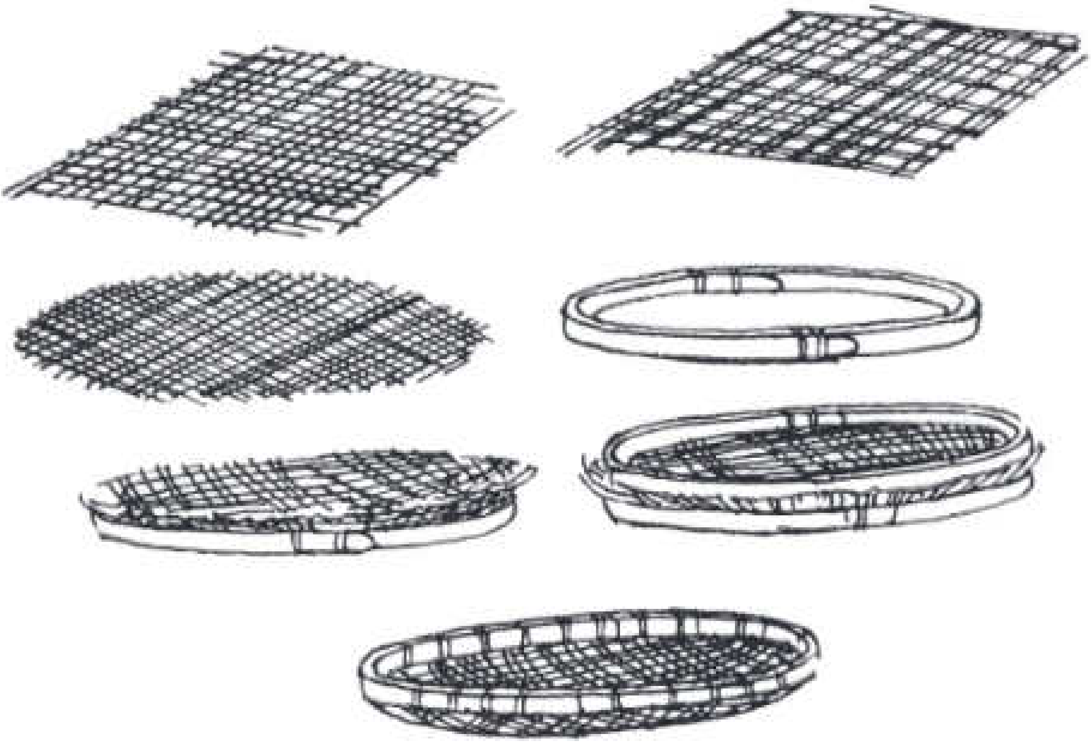

ডালা ও চালনি তৈরি করার পদ্ধতি

ছোটো চাক বড়ো চাকের ভেতর মোটামুটিভাবে বসে গেলে চাকের উপরে বেরিয়ে থাকা বুননের বাড়তি অংশ ধারালো ছুরি দিয়ে বড়ো চাকের সমান করে কাটি এবং চেপে চেপে চাক দুটির মুখ সমান করে নিই। ভিতরের চাকের বাঁধন কেটে দেই যাতে চাকটি প্রসারিত হয়ে বাইরের চাকের সাথে ঠেসে বসে যায়। চাক দুটির মুখের মাঝামাঝি ফাঁকের উপর বাঁশের সরু একটি বেতি বসিয়ে বুননসহ চাক দুটিকে সরু করে চেরা জালি বেত নিয়ে ক্রমান্বয়ে বেঁধে শেষ করে নেব। এবার আমরা যেকোনো মাপের ডালা, চালনি কিংবা এ ধরনের যেকোনো জিনিস তৈরি করতে পারব। গ্রামে অনেকেই খুব সুন্দর সুন্দর ডালা ও চালনি তৈরি করতে পারে। সুযোগ পেলেই আমরা তাঁদের কাজ দেখে নেব, তাহলে বিষয়টি বুঝতে আরো সহজ হবে। জিনিসগুলো ছোট আকারে তৈরি করে আমরা খেলনা বা শখের জিনিস হিসেবে ব্যবহার করতে পারি।

ঝুড়ি

ঝুড়ির জন্য পাতি ও বেতি দুটোই ব্যবহার করতে হয়। আগেই জেনেছি, পাতি হয় চ্যাপ্টা ও পাতলা আর বেতি হয় লম্বা সরু পাতির চেয়ে পুরু। কমপক্ষে আধা ইঞ্চি চওড়া ও হাত তিনেক লম্বা বেশ কিছু পাতি নিয়ে নিচের ছবির অনুকরণে বৃত্তের মতো করে বসাই। সবগুলো পাতির মাঝামাঝি জায়গাটা যেন কেন্দ্রে পড়ে। এবার লম্বা বেতি নিয়ে কেন্দ্রে বৃত্তের আকারে বুনে যাই। একটা কথা বিশেষভাবে মনে রাখতে হবে যে, একসাথে দুটি বেতি নিয়ে বুনন আরম্ভ করতে হবে। ছবিতে লক্ষ করি প্রথম বেতি যে পাতির নিচ থেকে উপরে উঠছে দ্বিতীয় বেতি তার পাশের পাতির নিচ থেকে উপরে উঠেছে। বুনার সময় কেন্দ্র থেকে চারদিকে ছড়িয়ে যাওয়া পাতিগুলোকে প্রতিবারেই একটু একটু করে উপর দিকে টেনে নেব যেন বুনন একেবারে সমতল না হয়ে পরিধির দিকে আস্তে আস্তে উপরে উঠতে থাকে।

২০২৫

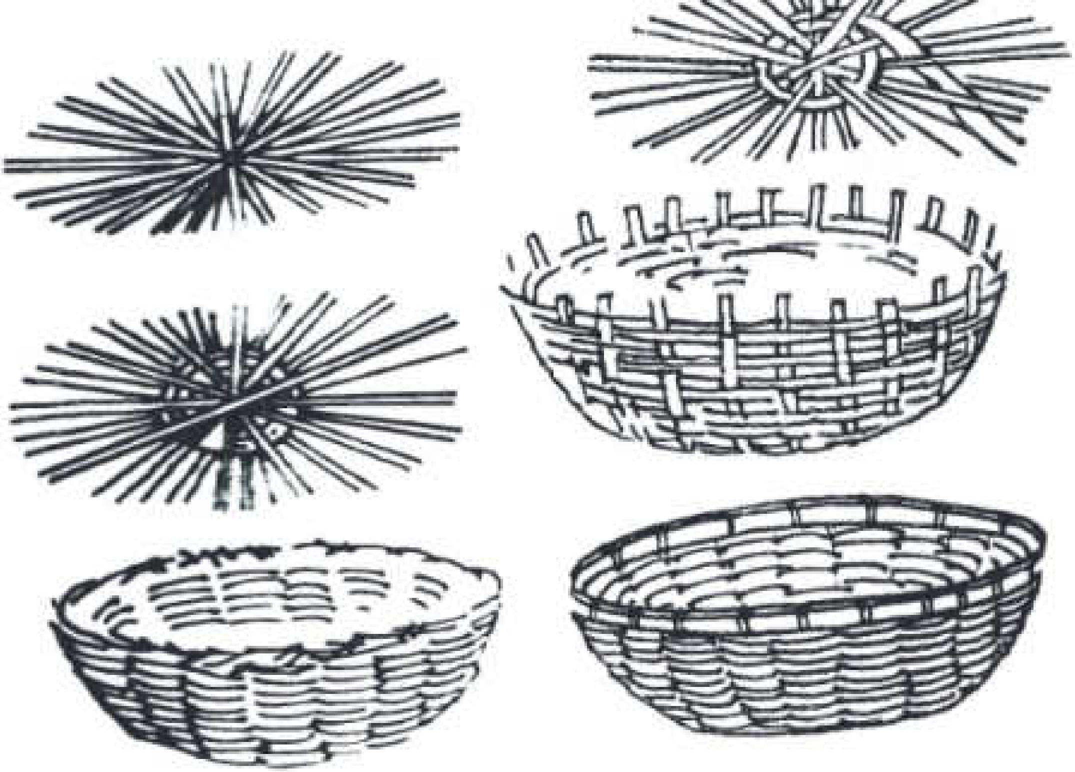

বাঁশের পাতি দিয়ে ঝুড়ি তৈরি করার পদ্ধতি

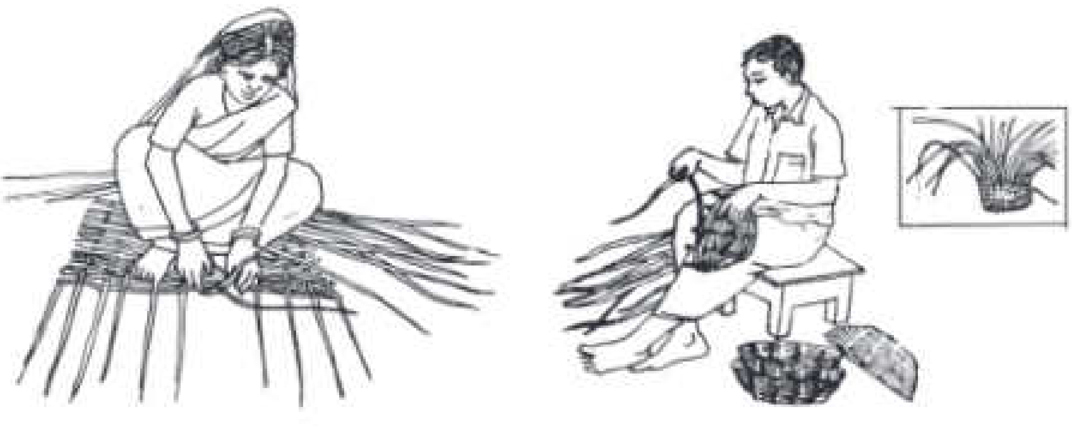

বাঁশের চাটাই ও ঝুড়ি তৈরি

বুনানো অংশের ব্যাস আট নয় ইঞ্চি হয়ে গেলে আরো কিছু পাতি নিয়ে আগের পাতিগুলোর ফাঁকে ফাঁকে আগের মতোই বৃত্তের আকারে বসাই এবং সমতলভাবে বেতি দিয়ে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে বুনে যাই। কয়েক লাইন বুনার পর সম্পূর্ণ জিনিসটি উল্টিয়ে বসাই এবং পাতিগুলো উপরের দিকে টেনে টেনে বেতি দিয়ে বৃত্তাকারে বুনে যাই। খেয়াল রাখব বুনন যেন

২০২৫

সমতল না হয়ে আস্তে আস্তে উপরের দিকে উঠে শেষ পর্যায়ে খাড়া হয়ে উঠে। এবার খাড়া হয়ে যাওয়া পাতিগুলোর দুই ইঞ্চির মতো বাড়তি রেখে বুনন শেষ করে নিই। পাতির বাড়তি অংশে ভাঁজ করে ঝুড়ির পরিধির সাথে সমান্তরালভাবে পেঁচিয়ে বেঁধে নিই। ইঞ্চিখানেক চওড়া ও প্রয়োজনমতো লম্বা দুটি বাঁশের চটা নিয়ে চেঁছে ছিলে চাকের জন্য তৈরি করি। এখন বুকের দিকে মুখোমুখি করে ঝুড়ির বাইরে ভেতরে বসিয়ে শক্ত করে বেঁধে নিই। এই পদ্ধতিতে আমরা ছোটো ছোটো খেলনা ঝুড়িও তৈরি করতে পারি, তবে তার জন্য বেতি, পাতি, চটা সবকিছুই সরু ও পাতলা হতে হবে যাতে খেলনা ঝুড়ির আকারের সাথে খাপ খায়।

খালই

খালই তৈরির জন্য প্রায় আধা ইঞ্চি চওড়া ও দুই হাত লম্বা পাতি ও লম্বা সরু বেতির প্রয়োজন। নিচে ছবির মতো পাতিগুলির মাঝে পোয়া ইঞ্চি করে ফাঁক রেখে সাত আট ইঞ্চি চওড়া করে লম্বালম্বিভাবে বসাই। ঐ একই পাতি আড়াআড়িভাবে ব্যবহার করে লম্বালম্বি পাতির মাঝখানটায় বুনে যাই। বুনানো অংশ লম্বা চওড়ায় সমান হয়ে গেলে এই বুনন শেষ করি। এবার এক জোড়া লম্বা বেতি নিই। বুনানো অংশের এক কোণা থেকে বেতির এক প্রান্ত দিয়ে ঝুড়ির বুননের মতো বাঁ দিক থেকে ডান দিকে বুনতে আরম্ভ করি। বুনন দ্বিতীয় কোণ পর্যন্ত পৌঁছে গেলে সম্পূর্ণ জিনিসটি বাঁ দিকে ঘুরিয়ে বসাই। বাঁয়ের অংশটি উপরের দিকে টেনে তুলে নিয়ে বেতিগুলো ঘুরিয়ে সামনের অংশ বুনে জোরে টেনে নিই। এবার বাঁ দিকের কোণে সামনের ও বাঁয়ের পাতি দুটির নিচের দিকে লম্বালম্বিভাবে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে বুনে নিই এবং প্রত্যেকটি কোণের পাতিগুলোকে গায়ে গায়ে লাগিয়ে নিই। দুই-তিন লাইন টেনে বুনার পর আর টানব না, এবার থেকে বাইরের দিকে সামান্য ঠেলে ঠেলে পরপর প্রসারিত করে বুনে যাই।

বাঁশের পাতি দিয়ে খালই তৈরি করার পদ্ধতি

খেয়াল রাখব বুননের সময় খাড়া পাতিগুলোর মধ্যেকার ফাঁক যেন সমান থাকে। খাড়া পাতির মাঝামাঝি পর্যন্ত প্রসারিত হয়ে উঠার পর বুননের সময় বেতি একটু টেনে খালইর মুখের দিকে ক্রমশ ছোট করে বুনি। পাতি দু ইঞ্চি বাড়তি রেখে বুনন শেষ করি। পাতির বাড়তি অংশটুকু মুখের সমান্তরালভাবে ভেতরের দিকে ভাঁজ করে সরু বেত দিয়ে পেঁচিয়ে বাঁধি। খালই মোটামুটি তৈরি হলো। এবার আধ ইঞ্চি চওড়া ও একখণ্ড বাঁশের চটা নিয়ে খালইর মুখের মাপে একটি চাক তৈরি করে উপরের দিকে বসিয়ে সুন্দর করে বেঁধে নিই।

বাকি রইল হাতল। লম্বা, মাঝারি ধরনের মোটা একই মাপের দুই খণ্ড আলি বেত নিই। একই পাশ থেকে ছিলে প্রত্যেকটির দুই মাথা আধা ফালি করে নিয়ে ছবির মতো খালইতে লাগিয়ে সরু চেরা বেত দিয়ে সুন্দর করে বেঁধে নিলেই খালই তৈরি শেষ হলো। দৈনন্দিন জীবনে খালই যেমন ব্যবহার হয় তেমনি শখের জিনিস হিসেবে ছোটো ছোটো খালই তৈরি করে ঘরে রাখতে পারি।

পাঠ : ১০, ১১ ও ১২

মুর্তা ও বেতের কাজ

মুর্তা ও বেত আমাদের দেশে সব জায়গায় পাওয়া যায়। কোথাও কম কোথাও বেশি। সিলেট, কুমিল্লা, নোয়াখালী, চট্টগ্রাম প্রভৃতি জেলায় মুর্তা ও বেত প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। তাই এসব স্থানে পাটি, মুর্তার ও বেতের তৈরি চাটাই এবং নকশা করা মাদুরও প্রচুর পরিমাণে তৈরি হয়। সিলেটের পাটি দেশ–বিদেশে বিখ্যাত।

মুর্তার ব্যবহার উপযোগী অংশটি সাধারণত পাঁচ-ছয় ফুট লম্বা। এর মধ্যে কোনো গিট থাকে না। উপরিভাগ শক্ত মসৃণ, কাঁচা অবস্থায় গাঢ় সবুজ। ভেতরের অংশ সাদা ও শোলার মতো নরম। মুর্তার উপরের শক্ত ও মসৃণ অংশটুকু কাজে লাগে, নরম অংশ ফেলে দিতে হয়। পাটি, মাদুর, চাটাই কিংবা অন্যান্য যেকোনো জিনিস তৈরি করতে গেলেই মুর্তা এবং বেত ছিলে পাতি তৈরি করে নেব। ছোটো-বড়ো বিবেচনা করে প্রথমে মুর্তা ও বেতকে লম্বালম্বি চার থেকে আট ফালি করে চিরে নেব। বুকের নরম অংশটা সাবধানে চেঁছে ফেলে দিব, যেন বুকের সাথে পিঠের শক্ত অংশ কাটা না পড়ে।

এই অবস্থায় পাতি যথেষ্ট পুরু রয়েছে এবং বুকের সাদা নরম জিনিসটি আংশিকভাবে থেকে গিয়েছে। এবার বাঁশের একটি খুঁটির সাথে পেঁচিয়ে বুকের দিক উপরে রেখে পুরু পাতিগুলোকে আগাগোড়া টেনে নিই যাতে বুকের দিকটা কেটে গিয়ে মসৃণ পিঠের দিকটা সমতল হয়ে যায়।

এভাবে পাতিগুলোর বুক ফাটানো ও পিঠ সমতল হয়ে গেলে বুকের দিকটা আবার ভালো করে চেঁছে নিই। দেখি পাতিগুলো বেশ পাতলা হয়ে গেছে। প্রয়োজনবোধে আবার লম্বালম্বিভাবে চিরে সরু করে নেব। চাটাই ও মাদুরের জন্য এই পর্যায়ের পাতি ব্যবহার করা হয় কিন্তু পাটির জন্য আরো সূক্ষ্ম পাতির প্রয়োজন। ভালো পাটি তৈরির উপযোগী পাতি তৈরি করা শিখতে দীর্ঘদিনের অধ্যবসায়ের প্রয়োজন। পাতি তৈরি করার পর দুই–তিন দিন পানিতে ডুবিয়ে রেখে আবার একটু শুকিয়ে নিয়ে কাজে লাগাব। মাদুর ও পাটিতে বুনে নকশা করার জন্য রঙিন পাতি ব্যবহার করতে হয়। মুর্তার মসৃণ পিঠের দিকে রং ধরতে চায় না, যে পাতিতে রং করব তা চেরার আগে মুর্তার পিঠের মসৃণ স্তরটা খুব হালকাভাবে চেঁছে নেব। গাঢ় রং পানিতে গুলে পাতিগুলো কয়েক ঘণ্টা ডুবিয়ে রেখে রং করব। পাটি অথবা মাদুরের জন্য সাধারণত লালের সাথে সামান্য সবুজ মিশিয়ে মেরুন রং ব্যবহার করা হয়। মুর্তা ও বেতের পাতি তৈরি ও রং করার কথা জানলাম। এবার কয়েকটি জিনিস তৈরি করি। প্রথমে চাটাই দিয়েই আরম্ভ করি।

চাটাই

মুর্তার চাটাই শোয়া, বসা, বিছানার নিচে পাতা প্রভৃতি বিভিন্ন কাজে ব্যবহার করা হয়। শহরবাসীদের মধ্যে এই চাটাইর ব্যবহার বেশি না থাকলেও গ্রামে–গঞ্জে, মফস্বলে এটা খুবই প্রচলিত। একটু চেষ্টা করলে আমরা চাটাই তৈরি করতে পারব।

চাটাই ছোটো হতে পারে আবার বড়োও হতে পারে। এর জন্য আয়তনের অনুপাতে প্রয়োজনীয় লম্বা ও আধা ইঞ্চির মতো

চওড়া পাতি নেব। বুননের সময় প্রয়োজনবোধে পাতির মাথার উপর নতুন পাতি বসিয়ে জোড়া দিয়ে আরো লম্বা করতে পারি। মুর্তার পাতি একটু চওড়া হলে সাধারণত তার গায়ে লম্বালম্বি থাকে। যাতে চাটাই মোলায়েম হয় ও দেখতে ভালো লাগে। দুধারা পদ্ধতিতে চাটাই বুনতে হয়। চতুর্দিকে দেড় থেকে দুই ইঞ্চি পাতি বাড়তি রেখে বুনন শেষ করি। এবার পাতির বাড়তি অংশ নিচের দিকে একটি একটি করে ভাঁজ সরু করে চেরা পাতি বেত দিয়ে বেঁধে নেব। একে চাটাইর মুড়ি বাঁধা বলে। উপরের ছবিতে মুড়ি বাঁধার পদ্ধতি দেখে নিই। বাঁধানের বেত কীভাবে চালাতে হবে খুব ভালো করে লক্ষ করি।

মাদুর

চাটাই তৈরি শেখার পর মাদুরে হাত দিই। মাদুর সাধারণত শোয়া ও বসার জন্য ব্যবহার করা হয়। নকশা করা সুন্দর সুন্দর মাদুর জায়নামাজ হিসেবে খুবই জনপ্রিয়। ঘর সাজানোর জন্য সুন্দর নকশা করা মাদুর আজকাল শহরবাসীদের সমাদর লাভ করেছে। মাদুরের জন্য দেড় সুতা পরিমাণ চওড়া পাতলা পাতির প্রয়োজন। বুনে নকশা করার জন্য রঙিন পাতিও লাগবে। রং ছাড়া পাতি লম্বালম্বিভাবে সাজিয়ে রঙিন পাতি আড়াআড়ি বসিয়ে নকশার প্রয়োজনমতো এক ধারা, দুধারা, তেধারা ইত্যাদি পদ্ধতি মিলিয়ে বুনে যাই। বুনন শেষ হলে মুড়ি বাঁধার পদ্ধতিতে মুড়ি বেঁধে নিই। চাটাইর মুড়ি বাঁধার জন্য যে বেতের ফালি ও সরু বেত ব্যবহার করেছি, মাদুরের জন্য তার চাইতে সরু ফালি ও বেত ব্যবহার করব। এবার আমরা আমাদের জন্য ছোটো-বড়ো মাদুর তৈরি করতে পারব।

পাটি

মুর্তার তৈরি জিনিসের মধ্যে পাটির কদর সবচেয়ে বেশি। গ্রীষ্মের প্রচণ্ড গরমে বিছানার উপর পেতে শোয়া খুবই আরামদায়ক। এতে গরম কম লাগে বলে পাটিকে শীতলপাটিও বলা হয়। ভালো পাটি বিশেষ করে সুন্দর নকশা করা পাটিও তার জন্য সূক্ষ্ম পাতলা পাটি তৈরি করতে বহুদিনের অভিজ্ঞতা ও উচ্চমানের কারিগরি দক্ষতার প্রয়োজন। এখন আমাদের পক্ষে এ কাজ করা কঠিন। তবুও অতি সাধারণ পাটি বুনার পদ্ধতি সম্পর্কে সামান্য ধারণা নিয়ে রাখছি।

শেখার জন্য মাদুর তৈরির উপযোগী পাতি দিয়ে পাটি বুনার চেষ্টা করতে পারি। পাটি বুনতে চাটাই বা মাদুরের মতো লম্বালম্বি ও আড়াআড়িভাবে আলাদা আলাদা পাতি ব্যবহার করার প্রয়োজন হয় না। বুননও লম্বা বা চওড়ার দিক থেকে আরম্ভ করতে হয় না। পাটির বুনন আরম্ভ হয়ে এক কোণ থেকে এবং একই পাতি ভাঁজ হয়ে আড়াআড়ি থেকে লম্বালম্বি পাবার প্রয়োজনবোধে লম্বালম্বি থেকে আড়াআড়িভাবে চলে যায়। এতে পাটির চারদিকে বাড়তি পাতি থাকে না, আপনা থেকেই মুড়ি বন্ধ হয়ে যায়, চাটাই বা মাদুরের মতো মুড়ি বাঁধার প্রয়োজন হয় না। প্রথমে একটি পাতি নিয়ে ছবিতে দেখানো নিয়মে ভাঁজ করি। আরেকটি পাতি নিয়ে ছবি দেখে প্রথমে আড়াআড়িভাবে বসিয়ে দুদিক ভাঁজ করে লম্বালম্বি দিকে নিয়ে যাই। ভাঁজ করার সময় লক্ষ রাখবে পাতির পিঠ যেন সব সময় উপরের দিকে থাকে। তার জন্য দুবার ঘুরিয়ে ভাঁজ করতে হবে। এবার তৃতীয় পাতি নিয়ে অনুরূপভাবে বুনে যাই। সাধারণ পাটির বুনন হবে দুধারা পদ্ধতিতে। এভাবে একের পর এক পাতি বসিয়ে বুনে যাই। একটা জিনিস খেয়াল করি এ পর্যন্ত বুননের সময় পাতি প্রথমে আড়াআড়ি বসিয়ে ভাঁজ করে লম্বালম্বি করা হয়েছে। বুননের সাথে সাথে পাটির লম্বা ও চওড়া দুদিকেই সমানভাবে বাড়ছে। পাটি চওড়ার চেয়ে লম্বা বেশি হয়। পাটি প্রয়োজনমতো চওড়া হয়ে গেলে এবার লম্বালম্বি পাতি ভাঁজ করে আড়াআড়ি করব। আবার প্রয়োজনবোধে আড়াআড়ি থেকে লম্বালম্বি করব। পাটির লম্বার দিকের একপাশ প্রয়োজনমতো লম্বা হয়ে গেলে পাতি ভাঁজ করে করে বুনে বাকি অংশটা শেষ করব।

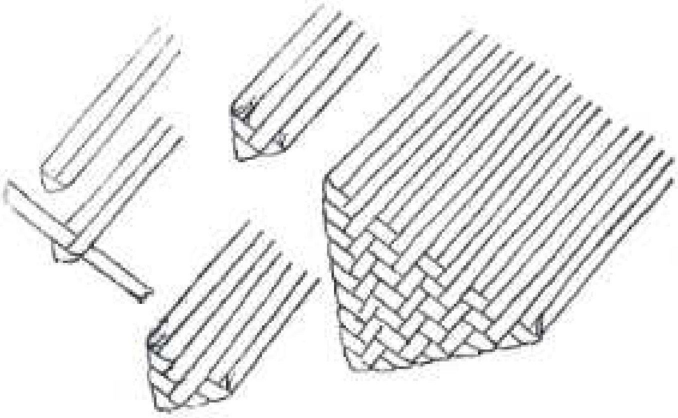

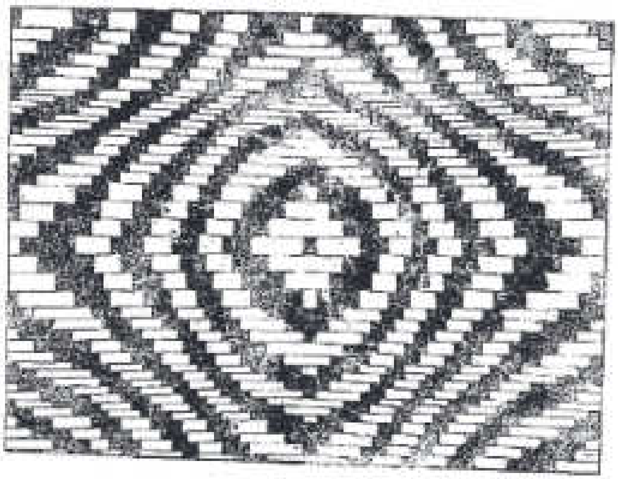

চাটাই তৈরি করার প্রাথমিক পর্যায়

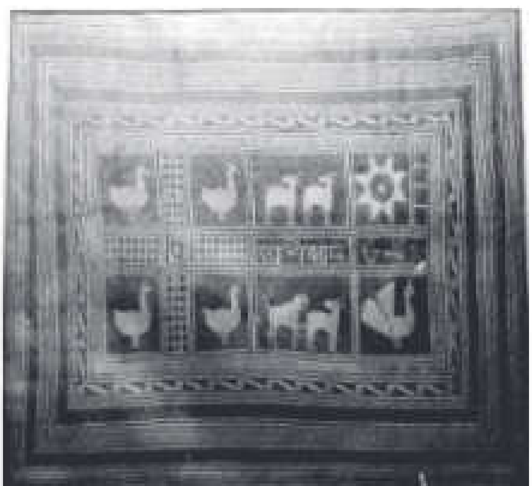

নকশা করা পাটি

পাঠ : ১৩, ১৪ ও ১৫

টাই ও ডাই

উপকরণ : কাপড়, সুতা, আলপিন, সেফটিপিন, নুড়ি, ছিপি, বোতাম, ধান, সোডা (কাপড় কচার), লবণ, চা চামচ, বড়ো চামচ, রং, বোল বা বাটি, গুঁড়ো মাপাবার নিক্তি, কেরোসিন স্টোভ, কাপড় ধোবার চাড়ি বা ডাবর, বালতি, বাটিক ফাস্ট কালার, ডাইলন রং, ইস্ত্রি ইত্যাদি।

টাই ও ডাই প্রণালিতে প্রস্তুত মনোমুগ্ধকর কারুশিল্প বহু শতাব্দী পূর্ব থেকে পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে সমৃদ্ধি লাভ করেছে। প্রতিবন্ধক সৃষ্টি প্রক্রিয়ার সাহায্যে এই পদ্ধতিতে কাপড়ের মধ্যে রং লাগিয়ে আকার, রূপ, রং ও নকশা সৃষ্টির দ্বারা এমন মনোরম কারুশিল্প সৃষ্টি করা যায় না। আধুনিক জীবনের জটিলতাজনিত টানাপোড়েনের হাত থেকে নিষ্কৃতি লাভের জন্য মানুষ যেহেতু ক্রমশই সৃজনশীল গৃহ নৈপুণ্যের দিকে ধাবিত হচ্ছে এবং সেহেতু বন্ধন ও রঞ্জন প্রণালির কারুশিল্প বিশেষভাবে ভাবসঞ্চারী আবেদন সৃষ্টি করেছে, কারণ এটি একটি সুন্দর শিল্প। এই প্রণালিতে প্রস্তুত কারুশিল্প আকর্ষণীয়তায় এবং ব্যবহারোপযোগিতায় অনন্য। 'বন্ধন–রঞ্জন' প্রণালিতে রঞ্জিত কাপড় বা চিত্তাকর্ষণ ও মনোহরণে অপূর্ব, তা দিয়ে কাপড়, গলাবন্ধ, রুমাল, ওড়না, চাদর, কুশন, পর্দা, বিছানার চাদর, টেবিলের কাপড় ইত্যাদি হরেক রকম গৃহসজ্জার সামগ্রী তৈরি করা যায়। 'বন্ধন ও রঞ্জনে' প্রকৃত অর্থে এটাই বুঝিয়ে থাকে। কাপড়কে বাঁধা হয়, ভাঁজ করা হয়, সেলাই করা হয়, গেরো দেওয়া হয় অথবা অন্যভাবে আবদ্ধ করা হয়, যাতে করে কাপড়ের সম্পূর্ণ অংশ রঞ্জন পাত্রে ডুবালে ভাঁজ করা অংশে রং প্রবেশ করতে না পারে এবং রঞ্জিত ও অ–রঞ্জিত কাপড় মিলে একটি সুন্দর এবং বর্ণাঢ্য নকশার সৃষ্টি হতে পারে। 'বাটিকে' কাপড়ের অংশ বিশেষ রং থেকে মুক্ত রাখার জন্য মোম দ্বারা লেপন করা হয়। প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টির দ্বারা রঞ্জন করার প্রতিটি পদ্ধতি বৈচিত্র্যময় নকশা, সহজ বা জটিল কারুশিল্পকে অসীম সুযোগ এনে দেয়। বন্ধন ও রঞ্জন এবং বাটিক ফাস্ট কালার (বাটিক রং) প্রুশিয়ান রং ও ইন্ডিগো রং ব্যবহৃত হয়, তা ছাড়া 'ডাইলন কোল্ড ওয়াটার ডাই' ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়; কারণ এতে কাপড়ের রং পূর্ণরূপে পাকা হয়, বহুবার লন্ড্রিতে ধোয়ানো হলেও রঙের উজ্জ্বলতা হ্রাস পায় না।

বাটিকের কাজের জন্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র

১। একটা মসৃণ সমতল কাঠের টেবিল। (একে ট্রেসিং টেবিল বলা হয়)
টেবিলের মাপ অনুসারে কাচের টুকরা উপরে থাকবে।

২। মোমের কাজ করার জন্য একটি কাঠের মসৃণ এবং সমতল টেবিল দরকার। এটি যেন খবরের কাগজ বা শক্ত হার্ডবোর্ড দিয়ে ঢাকা থাকে। এরকম টেবিলে মোমের কাজ করা ভালো।

৩। গ্যাসের/কেরোসিনের চুল্লি (স্টোভ)।

৪। এলুমিনিয়াম বা হাতলযুক্ত পাত্র।

৫। রজন (Resin) এবং চাক মোম (মৌচাকের মোম)।

৬। ব্লক এবং ব্রাশ (মোটা, চিকন)।

৭। একটা কাঠের তৈরি ফ্রেম। এর সাহায্যে নকশাতে মোম লাগাতে সুবিধা হবে। তার আগে কাপড়কে ফ্রেমে আটকাতে হবে। (কাজ করার সময় সতর্ক হয়ে কাজ করা দরকার)।

৮। কাপড়ের নকশা আঁকার জন্য পেনসিল, কার্বন কাগজ এবং মাঝারি শক্ত পেনসিল।

৯। বালতি বা টব। (এনামেল বা প্লাস্টিকের)

১০। রং মেশাবার জন্য ছোট আকারের স্টিলের পাত্র বা প্লাস্টিকের গামলা।

১১। মেজারিং সিলিন্ডার (মাপার যন্ত্র)। এর সাহায্যে তরল পদার্থকে মিমি. ও লিটারে মাপা যায়। (কাচ বা প্লাস্টিকের তৈরি)।

১২। রাবার বা প্লাস্টিকের শীট।

১৩। হাতের গ্লাভস বা দস্তানা। (এটি পাতলা রাবারের তৈরি)

১৪। পুরাতন খবরের কাগজ। (কাজ করার জায়গা ঢাকার জন্য)

১৫। বড়ো এবং ছোটো আকারের প্লাস্টিকের চামচ্।

১৬। বাটিক প্রিন্টের জন্য উপযুক্ত ধবধবে সাদা সুতি কাপড়।

বাটিকের কাজ

এ কাজে ব্যবহৃত সাজসরঞ্জামও খুবই সুলভ ও সাধারণ। রঞ্জন ক্রিয়া আগাগোড়া ঠান্ডা পানিতেই সম্পন্ন করা হয়, তবে আলগা রং উঠিয়ে ফেলার জন্য সবশেষে পাঁচ মিনিটের জন্য ফুটন্ত পানিতে চুবিয়ে রাখতে হয়।

বন্ধন ও রঞ্জনের পর কাপড় ভালোরূপে ধুইয়ে ভালো করে ইস্ত্রি করতে হবে। পেনসিল দিয়ে নকশা এঁকে নিতে হবে, নমুনাটি সুই–সুতা দিয়ে বখেয়া ফোঁড় দিয়ে সুতা টেনে বাঁধতে হবে, রং করতে হবে, ধুইয়ে নিতে হবে। অথবা নকশা ছাড়াও সাধারণভাবে বেঁধে নিলেও হবে। এছাড়া বিভিন্ন কৌটার মুখ বা অন্যান্য জিনিস ভিতরে বাঁধা যায়।

রং করার পদ্ধতি

১ টিন রং=১০ গ্রাম, ১/৩ আউন্স অথবা ২ বড়ো চা চামচ; ৪ বড়ো চামচ লবণ=আনুমানিক ১১২ গ্রাম অথবা ৪ আউন্স; ১ বড়ো চামচ সোডা= আনুমানিক ৪২ গ্রাম অথবা ১.৫ আউন্স।

উল্লেখিত জিনিস ২০ আউন্স পরিমাণ তরল রং তৈরি করতে হবে। স্বল্প এবং অধিক পরিমাণের জন্য রং, লবণ ও সোডা উপরে বর্ণিত অনুপাতে নিতে হবে। ১ টিন রং এক পাইন্ট পানিতে দ্রবণ করতে হবে। নাড়াচাড়া করতে হবে। ৪ বড়ো চামচ সাধারণ লবণ এবং ১ বড়ো চামচ সাধারণ সোডা এক পাউন্ড গরম পানিতে দ্রবণ করতে হবে নাড়াচাড়ার মাধ্যমে ঠান্ডা করতে হবে। যখন নমুনা প্রস্তুত হবে, কিন্তু তার আগে নয়, সলিউশন দুটি মিশ্রণ করতে নমুনাটি ভিজানো এবং ১.৫ ঘণ্টা থেকে ১ ঘণ্টা পর্যন্ত রং করতে হবে। প্রথম ১০ মিনিট নাড়াচাড়া করা এবং এরপর কিছুক্ষণ বিরতি দিয়ে নাড়াচাড়া করতে হবে। প্রথম ১০ মিনিট নাড়াচাড়া করা এবং এরপর কিছুক্ষন বিরতি দিয়ে নাড়াচাড়া করতে হবে।

যখন রং করা শেষ হবে, তখন নমুনাটি পাত্র থেকে উঠিয়ে ফেলতে হবে এবং পানি না শুকানো পর্যন্ত চিপড়াতে হবে। ফুটন্ত পানিতে নমুনাটি ঢেকে রাখতে হবে (সিল্ক এবং উলের জন্য গরম পানি) মাঝে মাঝে নাড়াচাড়া করতে হবে; এভাবে পাঁচ মিনিট রাখতে হবে। উত্তমরূপে পানি দ্বারা পরিষ্কার করা এবং শুকানো, একত্রিত করে এবং পানি দ্বারা পরিষ্কার করতে হবে। যখন নমুনা একত্রিত হয়ে যায়, তখন দ্বিতীয়বার গরম পানিতে ধৌত করা উত্তম। শেষবার ধৌত

২০২৫

করার পর নমুনাটি ইস্ত্রি করতে হবে, তাতে ভাঁজের দাগ এবং আর্দ্রতা দূর হয়ে যাবে। দ্বিতীয় রঙে রঞ্জিত করতে হলে পয়েন্টে বাঁধতে হবে। পকেট পূর্ণ বন্ধন করে এভাবে সজ্জিত করতে হবে যেন বাঁধানোর বাইরের অংশে প্রয়োজনীয় রঙে রঞ্জিত হতে পারে। দ্বিতীয় রঙের জন্যও রঞ্জন প্রক্রিয়া একইভাবে করতে হবে। নমুনাটিকে একত্রিত করার জন্য গেরো বাঁধার সুতা কেটে ফেলতে হবে।

একবার সোডা মিশ্রণ করলে রংটি ২ থেকে ৩ ঘণ্টা পর্যন্ত কার্যকর থাকবে। রং যদি প্রয়োগের কিছু পূর্বে মিশ্রণ করতে হয়, তবে রঙের সলিউশন এবং লবণ ও সোডার সলিউশন দুটি আলাদাপাত্রে রাখতে হবে। তারপর প্রত্যেকটি সমপরিমাণে মিশ্রণ করতে হবে। ছিপি খুব এঁটে লাগালে এই রং বেশ কয়েকদিন পর্যন্ত ব্যবহার করা চলে। ডাইলন কোল্ড ওয়াটার ডাই কাপড়, লিনেন, ভিসকোস, রেয়ন, সিল্ক এবং উলের জন্য আদর্শ রঞ্জক।

বন্ধন ও রঞ্জনের কলাকৌশল

গ্রন্থি বা গেরো পরীক্ষার জন্য একটি গ্রন্থি বাঁধতে হলে দেখতে হবে এতে কতটুকু কাপড় লাগে, গ্রন্থির অবস্থা চিহ্নিত করতে হবে।

১নং প্রণালি : একটি কাপড় লম্বালম্বিভাবে অর্ধেক করে ভাঁজ করতে হবে, এটি পাক দিতে হবে এবং প্রথম চিহ্নিত স্থানে একটি গ্রন্থি বাঁধতে হবে। প্রদর্শিত গ্রন্থির ন্যায় ফাঁক ফাঁক করে গ্রন্থিগুলো বাঁধতে হবে।

২নং প্রণালি : কাপড়ের একটি স্বল্পতম নির্দিষ্ট অংশ তুলতে হবে, এটি পাক দিতে হবে এবং একটি গ্রন্থি বাঁধতে হবে। নমুনার পরিকল্পিত স্থানে আবার ঐরূপ করতে হবে। যদি কাপড়ের আয়তক্ষেত্রের মধ্যভাগে গ্রন্থিটি বাঁধা হয়, তবে প্রত্যেক কোণে অন্য গ্রন্থিগুলো বাঁধতে হবে।

সকল প্রণালির জন্য : গ্রন্থিগুলো এঁটে বাঁধতে হবে এবং প্রথম রংটি দিতে হবে পুনরায় গ্রন্থিগুলো বাঁধতে হবে এবং দ্বিতীয় রংটি দিতে হবে। পরে পানি দ্বারা পরিষ্কার করতে হবে। গরম পানিতে ধুয়ে শুকাতে হবে। স্ক্রু ঘুরানোর ন্যায় গ্রন্থিগুলো প্রত্যেক পার্শ্বে পাকিয়ে একত্রিত করতে হবে। গ্রন্থিগুলো তখন একত্রিত করার পক্ষে বেশ আলগা ও সুবিধাজনক হয়ে উঠবে। পরে ধুয়ে শুকাতে হবে।

সকল প্রকার বাঁধনের জন্য শক্ত সুতা, নাইলন সুতা ইত্যাদি ব্যবহার করা যায়। লম্বালম্বিভাবে কাপড় জড়ো করা অথবা ভাঁজ করতে হবে। সুতোর এক পার্শ্বে গেরো দিতে হবে। কিছুক্ষণ পরপর সরু বাঁধন দিতে হবে। ডোরার উপর শক্ত বাঁধন দিতে হবে। তাড়াতাড়ি বেঁধে বা উপরোক্ত তিন প্রকারের মিশ্রণ গেরো বেঁধে, শক্ত করে বাঁধতে হবে এবং রং করতে হবে। রং করার পূর্বে আরও রং যোগ করা যায় অথবা গ্রন্থি পরিবর্তন করা যায়।

চতুষ্কোণ : এক প্রস্থ মিহি কাপড় চার ভাঁজ করে তারপর তাকে একটি ত্রিভুজাকারের রূপ দিতে হবে। সবগুলো বেঁধে পরে রং করতে হবে।

মার্বেল রং : ছোটো নমুনা নিয়ে কাপড় হতে গুচ্ছ করতে হবে। সুতার গ্রন্থি বাঁধতে হবে। একটি শক্ত বল তৈরি করার জন্য এটিকে সব স্থানে বাঁধতে হবে।

টেবিলের উপর কাপড় সটান করে রাখতে হবে। কাপড়ের এপাশে ওপাশে কাজ করে এবং কাপড়ের নির্দিষ্ট অংশ ফাঁক করে গোলাকৃতি করতে হবে যাতে করে পড়ে ভাঁজ পড়ে। কাজ করার সময় একটি আলগা বাঁধন দিতে হবে। যখন সমস্ত কাপড় গুচ্ছাকৃতি হয়ে যায় তখন একটি শক্ত গুচ্ছ তৈরির জন্য আরও বাঁধন লাগাতে হবে। উভয় প্রণালির জন্য

প্রথমে রংটি দিয়ে ধুয়ে ফেলতে হবে এবং একত্রিত করতে হবে। কাপড় পুনরায় বিন্যস্ত করে বাঁধতে হবে এবং দ্বিতীয় রং লাগাতে হবে।

একতাল কাপড় বন্ধন

ছোটো ছোটো জিনিস যেমন নুড়ি, ছিপি, বোতাম, ধান ইত্যাদি কাপড় গ্রন্থিত করা যায়। এদের অবস্থান পেনসিলের সাহায্যে 'ডট' দিয়ে চিহ্নিত করতে হবে। প্রথম 'ডটে' কোনো একটি জিনিস কাপড়ের ভেতর রেখে এবং এর চারপাশে সুতা দিয়ে বাঁধতে হবে। সুতাটিকে সামনের দিকে টেনে নিয়ে এবং পরবর্তী 'ডট' কেও যথাস্থানে বাঁধতে হবে।

এর উপর একটি আলগা গ্রন্থি বাঁধতে হবে। এপাশে ওপাশে কাজ করার সময় প্রত্যেকটি জিনিস এভাবে বাঁধতে হবে অথবা মধ্যভাগ থেকে বহির্ভাগের দিকে বাঁধতে হবে।

পরিবর্তন : বন্ধন–স্থান এক টুকরো 'পলিথিন' দিয়ে ঢেকে ডবল করে বাঁধতে হবে। একটির উপর আর একটি বাঁধতে হবে। জিনিসটিকে ঢেকে একটি মৌচার মতো করে উপরের দিকে বাঁধতে হবে। পরে রং দিতে হবে।

বৃত্ত কাপড়ের একটি নির্দিষ্ট অংশে দিতে হবে। একটি ছোটো বৃত্তের জন্য কাপড়ের নির্দিষ্ট অংশে সুতা দ্বারা বেঁধে অপেক্ষাকৃত বড়ো একটি বৃত্তের জন্য আরও সামনের দিকে অনুরূপভাবে বাঁধতে হবে। নির্দিষ্টস্থানে ডিজাইনের জন্য প্রয়োজনীয় বাঁধন দিতে হবে। বাঁধন দৃঢ় করে পরে রং করতে হবে। অন্য রং দেয়ার পূর্বে বাঁধন পরিবর্তন অথবা অন্য বাঁধন যোগ করা যেতে পারে।

ডিম্বাকৃতি এবং অসমকোণী ত্রিভুজ

আকৃতির মধ্যভাগ বরাবর কাপড় ভাঁজ করে ভাঁজের বিপরীতে অর্ধেক ডিম্বাকৃতি এবং অসমকোণী ত্রিভুজ তৈরি করতে হবে। পেনসিলের লাইন বরাবর 'সেফটিপিন' দ্বারা বুনন করতে হবে। পিন আটকানো, পিনের নিচে সুতা দিয়ে বাঁধানো পিন সরিয়ে ফেলতে হবে। প্রয়োজনমতো পাখার আকৃতি বিশিষ্ট নমুনা বেঁধে দৃঢ় করতে হবে। প্রত্যেক আকৃতির জন্য এই প্রক্রিয়ার পুনরাবৃত্তি করতে হবে। পরে রং লাগাতে হবে। অন্য রং দেয়ার পূর্বে বাঁধন পরিবর্তন অথবা অন্য বাঁধন যোগ করা যেতে পারে।

পাঠ : ১৬ ও ১৭

বাটিক

উপকরণ : ট্রেসিং পেপার, জলরং তুলি (নং ২ ও ৩), পোস্টার কাগজ, তেলরঙের তুলি (নং ৪ ও ৮) লাল ও সাদা মোম, লবণ, সোডা (কাপড় কাচা), এলজিনেট (গুঁড়া জাতীয় আঠা), কাপড় ফিটকরী, সোডিয়াম নাইট্রেট, সালফিউরিক এসিড, মনোপল সপ, কস্টিক সোডা নেপথল রং (বাটিক রং), ফাস্ট কালার (বাটিক রং), প্রুশিয়ান রং, ইন্ডিগো রং ইত্যাদি।

বি.দ্র. নতুন কাপড় প্রথমে ব্যবহার করার পূর্বে সাবান দিয়ে ধুয়ে ইস্ত্রি করা একান্ত প্রয়োজন।

বাটিক সৃষ্টিশীল কাজের অন্যতম মাধ্যম। এর ইতিহাস বা উৎস সম্পর্কে সঠিকভাবে কিছু বলা মুশকিল। তবে বাটিকের উৎপত্তি সম্পর্কে এটুকু বলা যেতে পারে যে, এর প্রচলন প্রাচ্য দেশসমূহে বিশেষ করে ইন্দোনেশিয়ার জাভা, বালি ও তৎসংলগ্ন দেশসমূহে ব্যাপকভাবে দেখা যায়। বর্তমানে এসব দেশে বাটিকশিল্প এক গৌরবময় ঐতিহ্যের সূচনা করেছে এবং অত্যন্ত জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। এসব দেশ হতে বাটিকশিল্প ক্রমান্বয়ে পৃথিবীর অন্যান্য দেশেও ছড়িয়ে পড়েছে। বর্তমানে অনেক দেশে বাটিক কাজ দ্রুত উন্নতির দিকে এগিয়ে চলেছে। বাংলাদেশেও বাটিকের কাজ বর্তমানে

বেশ দেখা যায় এবং দেশের সর্বত্রই এর প্রচলন পরিলক্ষিত হচ্ছে। কেউ কেউ উন্নয়ন প্রকল্পের গবেষণায় বাটিক কাজ করে যাচ্ছেন। আর কেউবা বাণিজ্যিক ভিত্তিতে এই শিল্পকে ব্যবহার করছেন।

বর্তমানে আমাদের দেশে বাটিক কাজ দুটি পদ্ধতিতে করা হয়, যথা- (১) Napthol color (২) Procion color (reactive dyes)

প্রথমে বাটিক উপযোগী নকশা অঙ্কন করে পরে ট্রেসিং পেপারের সাহায্যে নকশা কাপড়ে উঠাতে হয়।

নেপথল রং করার প্রণালি : বাটিক কাজ করার পদ্ধতিতে ধারাবাহিক পাঁচটি স্তর রয়েছে। তা জেনে নিই।

মোম বাটিকের ছবি

প্রথম স্তর : প্রথম পর্যায় নকশা অনুযায়ী কাপড়টিতে যেখানে রং ব্যবহার করা হবে সে অংশটুকু ছাড়া বাকি অংশে 'মোম-গরম করে তুলি দিয়ে নকশার স্থান কাপড়ের উভয় পার্শ্বে লাগাতে হবে (স্বভাবত কাপড়ে মোমে আবৃত করা স্থানে রং লাগবে না)। রং করার পূর্বে ১০-১৫ মিনিট পর্যন্ত কাপড়টি ভিজিয়ে নেওয়া একান্তই প্রয়োজন।

দ্বিতীয় স্তর : নকশা করা কাপড়টি রং মিশ্রিত পানিতে প্রথমে প্রথম পাত্রে ও পরে দ্বিতীয় পাত্রে ২-৩ মিনিট রাখার পর একই প্রক্রিয়ায় বারবার চুবাতে হবে। এ প্রক্রিয়ায় চুবালে রং পরিষ্কারভাবে ফুটে উঠবে।

তৃতীয় স্তর : নকশা অনুযায়ী রং করার পর পুনরায় অন্য রঙের ব্যবহারের জন্য ও এই রংটি রাখার জন্য প্রয়োজনবোধে মোম দ্বারা একই পদ্ধতিতে কাপড় আবৃত করে পাত্রে চুবাতে হবে। মনে রাখতে হবে একই প্রক্রিয়ায় বারংবার পাত্র পরিবর্তন করে চুবানো হয়। এভাবে কাপড়ে অনেক প্রকার রঙের ব্যবহার করা যায়।

চতুর্থ স্তর : কাপড়টি রোদহীন ঠান্ডা জায়গায় একটানা ১২ ঘণ্টা ছায়ায় শুকাতে হবে।

২০২৫

পঞ্চম স্তর : অল্প ক্ষারযুক্ত সাবান ফুটন্ত পানিতে মিশ্রিত করে কাপড়টি অতি যত্নসহকারে সেই পানিতে ৪-৫ মিনিট কাপড়টি রাখার পর ছায়ায় শুকাতে হবে। এইভাবে Napthol color process-এ বাটিক প্রিন্ট হয়ে থাকে।

মোম তৈরিকরণ : সমপরিমাণ প্যারাফিন মোম (সাদা মোম) ও ভিট মোম (লাল মোম অর্থাৎ মৌমাছির মৌচাকের মোম) একত্রিত করে ব্যবহার করতে হয়।

Napthol color process-এ রং করার সূত্র :

(কাপড়ের ওজন অনুপাতে)

প্রথম পাত্র	দ্বিতীয় পাত্র
(Impregneting bath)	(Developing bath)
	Salt রং এর বেলায়
বিশগুন পানিতে	বিশগুন পানিতে

নকশায় মোম লাগানোর নিয়ম

নিয়ম-১	নিয়ম-২	নিয়ম-৩
সাদামোম -২ ভাগ	সাদামোম - ৬ ভাগ	মধুমোম -২ ভাগ
মধুমোম ১ ভাগ	রজন - ৩ ভাগ	সাদামোম -১ ভাগ
রজন (এন গ্রেড) -১ ভাগ	মধুমোম -১ ভাগ	রজন (এন গ্রেড) -১ ভাগ

মোম গলাবার পদ্ধতি

একটা স্টিলের তৈরি বাটিতে প্রথমে মধুমোম গলিয়ে কিছুটা ঠান্ডা করার পর তার সঙ্গে সাদা মোম মেশাব। এটা গলে যাবার পর রজন গুঁড়া মেশাব। সাদামোম পাত্র চুলার উপর রাখা অবস্থায় স্টিলের হাতা বা বড়ো চামচ দিয়ে নাড়ব। এভাবে নেড়েচেড়ে অন্যান্য নোংরা জিনিসগুলো চামচ দিয়ে ফেলে দেব। মোম গলে গেলে নকশায় মোম লাগাব। যখন পরিষ্কার মিশ্রণটা পাওয়া যাবে তখন সেই গলিত মোমকে কাপড়ে ব্রাশের সাহায্যে লাগাব। অবশ্য তার আগে দেখে নেব মিশ্রণ থেকে বাদামি রঙের ধোয়া উঠছে কি না, এই রঙের ধোঁয়া দেখতে পেলেই পাত্রটা চুলার ওপর থেকে নামিয়ে ফেলব। চুলার তাপে পাত্র সরাসরি বসিয়ে মোম লাগাবনা। এতে পুড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে। কারণ বেশি তাপ লাগলে মিশ্রণ রং করার সময় কাপড় থেকে ঝরে পড়ে যেতে পারে।

(ক) Napthol-As অথবা Branthol AS -3%

(খ) Fast Red salt-GL অথবা Branthol Salt-6%

(গ) মনোপল সপ অথবা TR Oil-3%

(ঘ) লবন-১২%

(ঙ) কস্টিক সোডা-১.৫%

শুধু Base color— এর কাজ করার সময় দ্বিতীয় পাত্র পরিবর্তন করতে হবে। যেমন–

দ্বিগুণ পানিতে।

(ক) ফিটকরী–৬৫

(খ) সোডিয়াম নাইট্রেট–৩%

(গ) সালফিউরিক এসিড (H_2SO_4)

অথবা হাইড্রোক্লোরিক এসিড (HCL)=3%

(ঘ) Fast Red KB-3%

Fast color বাটিক রঙের বিভিন্ন নামকরণ রয়েছে। যেমন– Fast color = Red KB. কেবল Napthol-AS-এর বেলায় প্রযোজ্য। কোনো ন্যাপথল, ব্রেনথল ইত্যাদির সাথে কোনো Salt বা Base যোগ করলে কী কী রং পাওয়া যায়, নিচের চার্টে তা জেনে নিই।

লাল=Napthol	As+Fast Red Salt GL
লাল=Napthol	As+Scarlet Salt GG
লাল=Napthol	As-Fast Scarlet R
লাল=Napthol	As+BS+Fast Red Salt R
লাল=Napthol	As-TR+Fast Red Salt TR
লাল=Napthol	As-BO+Fast Red Scarlet Salt R
লাল=Napthol	As-RL+Fast Red Scarlet Salt R
লাল=Branthol	As+Fast Red KB Base
লাল=Branthol	As+Fast Red Scarlet R Base
লাল=Branthol	MN+Fast Red Scarlet G Base
লাল=Branthol	BN+Fast Red Scarlet G Base
লাল=Branthol	BN+Fast Red Scarlet R Base
লাল=Branthol	BN+Fast Red KB Base
লাল=Branthol	CT+Fast Red Scarlet G Base
লাল=Branthol	CT+Fast Red Red KB Base
কমলা =Napthol	AS+Fast Orange Salt GC Base
কমলা =Napthol	AS+Fast Orange Salt GR Base

কমলা =Branthol	AS+Branthol fast Yellow GC
লাল=Branthol	AS+Branthol fast Orange GC Base
লাল=Branthol	AS+Fast Orange GR Base
লাল=Branthol	MN+Fast Orange GC Base
লাল=Branthol	CT+Fast Orange GC Base A
খয়েরি= Napthol	AS-BO + Napthol Red Salt B
খয়েরি= Napthol	AS + Napthol Garnet GBC Salt
খয়েরি= Napthol	AS + Bardo Salt GP Salt
খয়েরি= Branthol	AS + Branthol Bardo CP Base
খয়েরি= Branthol	AS + Branthol Fast garnnet GBC Base
খয়েরি= Branthol	MN + Branthol Fast Garnnet GBC Base
খয়েরি= Branthol	AN + Branthol Fast Garnnet GBC Base
খয়েরি= Branthol	AN + Branthol Fast Bardo GP Base
খয়েরি= Branthol	BN + Branthol Fast Bardo GP Base
খয়েরি= Branthol	BN + Branthol Fast Bardo GBC Base
নীল = Branthol	AS + Branthol Fast Blue Salt B
নীল = Branthol	AN + Branthol Fast Blue Salt B
নীল = Branthol	BN + Branthol Fast Blue Salt B
নীল = Napthol	AS + Fast Blue Salt BB
নীল = Napthol	AS + Fast Blue Salt BR
নীল = Napthol	AS-TR + Fast Blue Salt BR
নীল = Napthol	AS-OL + Fast Blue Salt BB
হলুদ = Napthol	AS-G + Fast Yellow Salt GC
হলুদ = Napthol	AS-G + Scarlet Salt GC
হলুদ = Branthol	AT+Branthol Yellow GC Base

ব্রেনথল ও ন্যাপথলের সমতুল্য তালিকা

Branthol AS=Napthol AS

Branthol MN=Napthol AS-BS

Branthol AN=Napthol AS-BO

Branthol PA=Napthol AS-RL

Branthol NG=Napthol AS-GR

Branthol BT=Napthol AS-BL

Branthol RB=Napthol AS-SR

Branthol FR=Napthol AS-OL

Branthol GT=Napthol AS-TR

Branthol DA=Napthol AS-BS

Branthol FD=Napthol AS-RG

Branthol AT=Napthol AS-G

Branthol BN=Napthol AS-SW

প্রুশিয়ান রং করার প্রণালি : এই পদ্ধতিটি Napthol color process-এরই অনুরূপ। তবে মোম তৈরিকরণ একটু ভিন্ন ধরনের। যথা–সাদা মোম ৪ ভাগ+রজন ২ ভাগ+ লাল মোম ১ ভাগ একত্রিত করে ব্যবহার করব।

Procion Color Process–এর রং করা পদ্ধতি : প্রথম পাত্রে প্রয়োজনানুসারে রং (Procion) ও লবণ ৩০% ভাগ অল্প পানিতে মিশ্রিত করব। দ্বিতীয় পাত্রে ২০ গুণ পানিতে প্রথম পাত্রের প্রস্তুত রং মিশ্রিত করে ভেজা কাপড়টি আধঘণ্টা নাড়াচাড়া করব। অতঃপর কাপড়টি উঠিয়ে ৮% ভাগ সোডা (কাপড় কাচা) মিশিয়ে পুনরায় রং করা কাপড়টি আধঘণ্টা নাড়াচাড়া করব, এরপর ঠান্ডা পানিতে ধুয়ে ২৪ ঘণ্টা হাওয়ায় শুকাতে দিব। শুকনো কাপড়টি অতঃপর ভিজিয়ে ফুটন্ত পানিতে ৪–৫ মিনিট নাড়ালে মোমগুলো পৃথক হয়ে যাবে।

প্রয়োজনানুসারে কাপড় রং করাতে হলে–

হালকা রঙের জন্য ১ তোলা থেকে ২ তোলা

মাঝারি রঙের জন্য ২ তোলা থেকে ৩ তোলা

গাঢ় রঙের জন্য ৩ তোলা থেকে ৪ তোলা

বি. দ্র. ১০০ তোলা কাপড়ের ওজনে।

প্রুশিয়ান রঙের তালিকা : Blue M_2R, Blue M_3R, Red M_8B, Red M_5B, Yellow M_6G, Orange M_2R ইত্যাদি।

Napthol অথবা Procion color পদ্ধতি ছাড়াও বাটিক প্রিন্ট কাপড়টিতে নকশা অনুযায়ী সবুজ, নীল বা বেগুনি রং রাখতে হলে Cold Dying করার পূর্বে যেখানে যে রং ব্যবহার করা হয়, তা Pigment process-এ করা হয়ে থাকে।

Pigment Process পদ্ধতি : বাজারে Indigo color বিভিন্ন রঙের পাওয়া যায়। উদাহরণস্বরূপ এক গজ কাপড়ের Pigment Process-এর রং করতে হলে Indigo color সিকি তোলা নিতে হবে। ১/৪ ছটাক পানি ফুটিয়ে গরম অবস্থায় দু আনা (১/৮ তোলা) সোডিয়াম নাইট্রেট মিশাতে হবে। পরে সিকি তোলা রং সোডিয়াম নাইট্রেট মিশ্রিত পানিতে ঠান্ডা করতে হবে অন্যদিকে আঠা Alginate (গুঁড়া জাতীয় আঠা) কুসুম গরম পানিতে ৫ মিনিট মিশালে আঠায় পরিণত হবে। অতঃপর প্রস্তুত Alginate আঠা ঠান্ডা রঙে মিশাতে হবে।

নকশা করা কাপড়টি প্রয়োজন অনুসারে ৯নং তুলি ব্যবহার করার মতো প্রস্তুত রং তুলি দিয়ে ব্যবহার করতে হবে। এভাবে বিভিন্ন ধরনের 'Indigo Color' নকশা অনুযায়ী ব্যবহার করা হয়ে থাকে। অতঃপর রং করা কাপড়টি ২/১ চা চামচ সালফিউরিক এসিড মিশ্রিত পানিতে নাড়ালে Indigo color-এর প্রকৃত রং বেরিয়ে আসবে। এই পদ্ধতিকে 'Pigment Process' বলে।

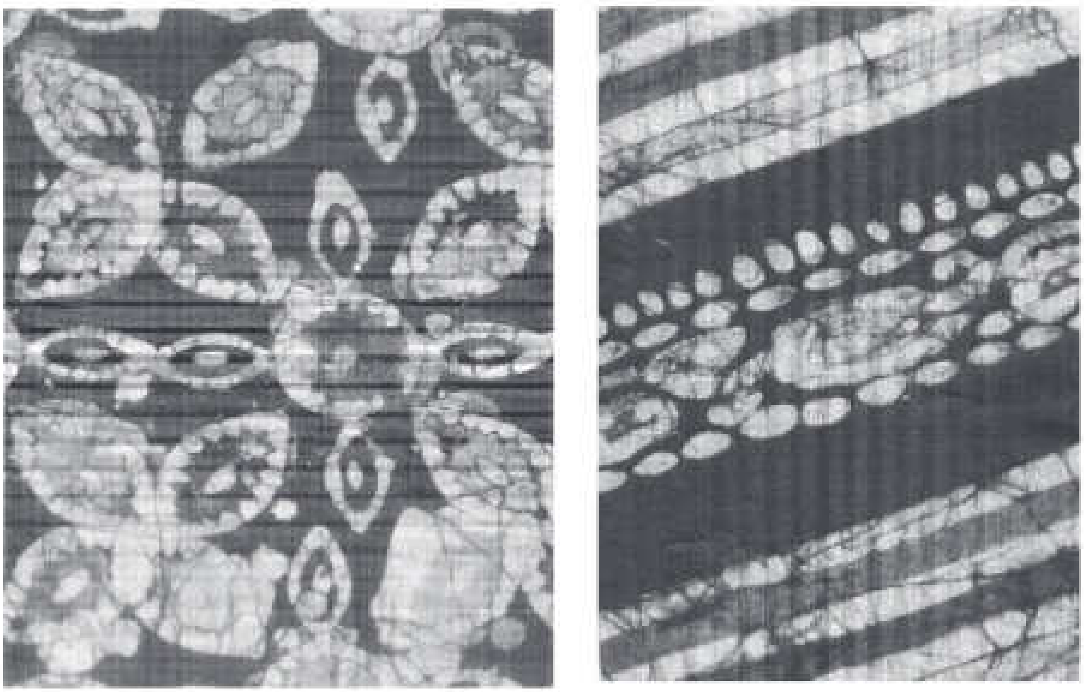

বাটিক প্রিন্টে ছাপা কাপড়

কাপড় ছাপা

ছাপা কাপড় আমরা সবাই কম-বেশি ব্যবহার করি। আমাদের পাঞ্জাবি, জামা, বিছানার চাদর, শাড়ি, ফ্রক, ওড়না ইত্যাদি রং-বেরঙের ছাপা কাপড় দিয়ে তৈরি করে থাকি। কাপড় ছাপার পদ্ধতি জানা থাকলে আমরা নিজেরাই আমাদের পছন্দমতো কাপড় ছেপে ব্যবহার করতে পারি।

ছাপার আগে কাপড়কে উপযোগী করে নিতে হবে, নইলে ভালো ছাপা বা রং ধরবে না। কোড়া কাপড় বা মাড় দেয়া কাপড়ে ভালোভাবে রং ধরে না। তাই কোড়া কাপড়ের ওজনের ১০ গুণ পানি নিয়ে প্রতি ১০ লিটার পানিতে ২ তোলা সাবান, ২ তোলা কাপড় কাচা সোডা ও ৩ তোলা কস্টিক সোডা ২/৩ ঘণ্টা সিদ্ধ করে প্রথমে গরম ও পরে ঠান্ডা পানিতে ভালো করে ধুয়ে নেব। ধোলাই করা কাপড় হলে শুধু সাবান পানিতে ১৫/২০ মিনিট সিদ্ধ করে ভালো করে ধুয়ে নিলেই কাপড় ছাপার জন্য তৈরি হয়ে গেল। এবার ছাপার পদ্ধতির কথা জানব–

টাই অ্যান্ড ডাই

সবচেয়ে সহজ পদ্ধতিতে অথচ আকর্ষণীয় কাপড় ছাপার জন্য টাই অ্যান্ড ডাই করা হয়। নামটা ইংরেজি। এর বাংলা করলে হবে বাঁধা এবং রং করা। আমরা বহুল প্রচলিত টাই অ্যান্ড ডাই নামটাই ব্যবহার করব। এ পদ্ধতিতে কাপড় বাঁধার জন্য শক্ত সুতা ও রং করার প্রয়োজনীয় জিনিস রাখব। এই পদ্ধতি অবলম্বন করে কাপড়ের নির্দিষ্ট স্থানে সুতা দিয়ে শক্ত করে বেঁধে রঙে চুবিয়ে অথবা রং ঢেলে দিলেই হবে। বাঁধা জায়গায় রং না লেগে এক ধরনের নকশার সৃষ্টি হবে। নির্দিষ্ট কোনো নকশা না হলেও অত্যন্ত আকর্ষণীয় নকশার সৃষ্টি হয়। নির্দিষ্ট নকশা করার জন্য সুঁই সুতার সাহায্য নেব। শাড়ি, লুঙ্গি অথবা অন্য কোনো কাপড়ে পরিমিত আকারে বর্গক্ষেত্র, আয়তক্ষেত্র, বৃত্ত, বরফি, ফুল পাতা বা অন্য কোনো নকশা কাপড়ে এঁকে নেব। এবার কাঁথা সেলাইয়ের ফোড় দিয়ে পার্শ্বরেখা বরাবর সেলাই করে এবং সুতার দুই প্রান্ত আস্তে আস্তে টেনে নকশার ভেতরের কাপড় লম্বা করে টেনে নেব। সেলাই পর্যন্ত সুতা দিয়ে পেঁচিয়ে শক্ত করে বেঁধে নেব। বাঁধার সময় কিছু জায়গা ফাঁক থাকলে ভালো হয়। এভাবে সবকটি নকশা বেঁধে নিতে হবে। তারপর রঙে চুবিয়ে নিয়ে নেড়েচেড়ে নিলেই হলো। একবার বেঁধে রঙে চুবালে এক রং, এমনিভাবে একাধিক রঙের জন্য কয়েকবার বেঁধে রঙে ডোবাতে হবে। প্রত্যেকবার বাঁধার আগে কাপড় ছায়ায় রেখে শুকিয়ে নেব। একাধিক রং করার সময় হালকা রং থেকে শুরু করব।

এই পদ্ধতিতে নির্দিষ্ট কোনো নকশা ছাড়াও বিভিন্ন পদ্ধতি অনুসরণ করে বাঁধার মাধ্যমে আকর্ষণীয় ও রুচিসম্মতভাবে কাপড় ছাপানো যায়। এই পদ্ধতিতে কিছু বাঁধার নমুনার ছবি দেখে নিই।

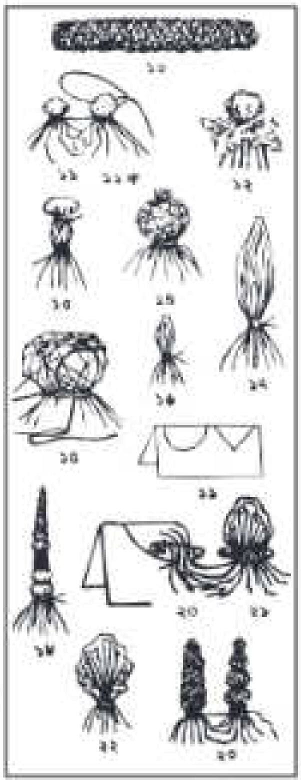

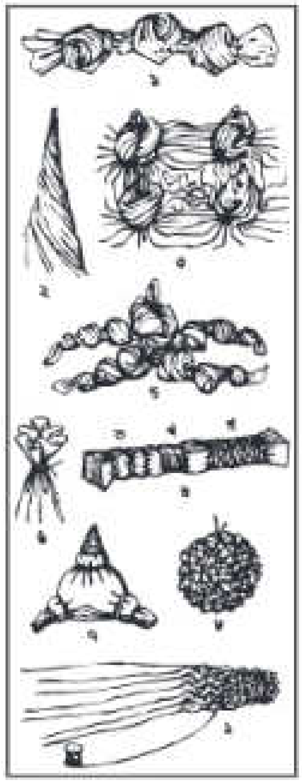

টাইডাই করার পদ্ধতি

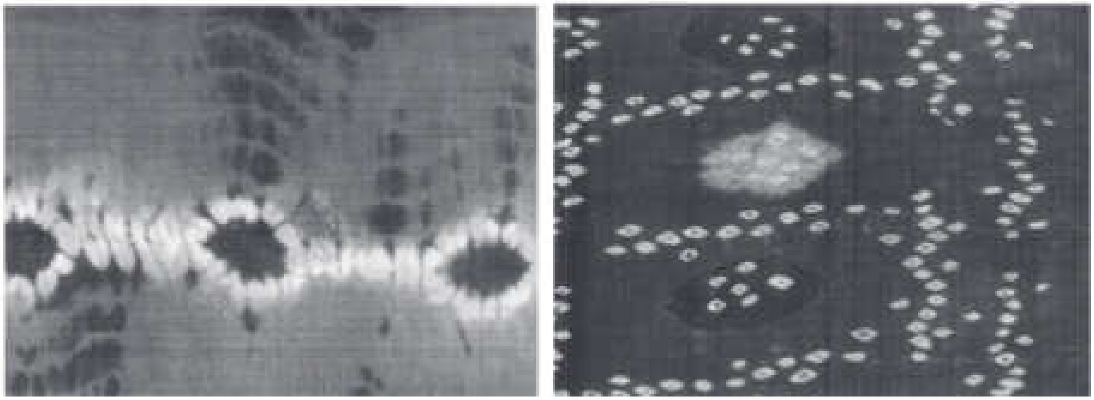

কাপড়ে করা টাই অ্যান্ড ডাই

মোম বাটিক

উপকরণ : এই পদ্ধতিতে কাপড়ে নকশা করার নিয়ম অনেকটা টাই অ্যান্ড ডাই পদ্ধতির মতো। অর্থাৎ নকশায় রং লাগতে না দিয়ে সমস্ত কাপড়ে রং লাগতে দেয়া। নকশায় যাতে রং লাগতে না পারে তার জন্য বিশেষ মোম দিয়ে ঢেকে দিতে হবে। এভাবে বিভিন্ন রং করে শাড়ি, ব্লাউজ, বিছানার চাদর, পর্দা, জামার কাপড়, ওড়না ইত্যাদি নকশা করা যায়।

এই পদ্ধতিতে সুন্দর ছবিও করতে পারি। যাকে বাটিকের ছবি বলে। এক রঙের বাটিক করতে সরাসরি কাপড়ের উপর পেনসিলে ড্রইং করে সেভাবে মোম লাগিয়ে রং করলেই চলবে। কিন্তু একাধিক রং হলে কাগজে রঙিন নকশা এঁকে নেব এবং পর্যায়ক্রমে মোম করব। কার্বন কাগজের সাহায্যে কাপড়ে নকশাগুলো এঁকে নিয়ে কাপড়ের সাদা অংশের দুপিঠেই মোম দিয়ে ঢেকে দিব। প্রথমে হলুদ রঙে চুবিয়ে ভালো করে রং করে নিই, তারপর ঠান্ডা পানিতে সামান্য ধুয়ে শুকিয়ে আবার হলুদ নকশার অংশে মোম দিয়ে ঢেকে দিব। এরপর পূর্বের মতো রঙে চুবিয়ে শুকিয়ে নিই এবং পরবর্তী হালকা রঙের অংশে মোম দিয়ে ঢেকে দিই। সবশেষে গাঢ় বা কালো রং করতে হবে।

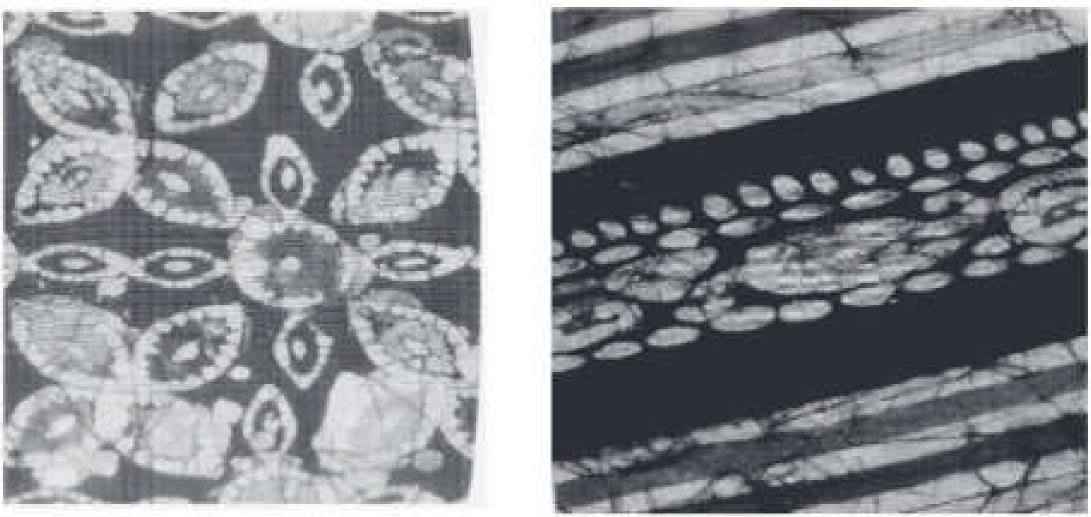

মোম বাটিকের কাজ

বাটিকের কাজে সব সময় ঠান্ডা রং ব্যবহার করতে হয়। টাই অ্যান্ড ডাইয়ের মতো বাটিকের জন্য একই নিয়মে রং করতে হয়। তাই পরবর্তী অধ্যায়ে রং তৈরির শিখন পদ্ধতি শিখে নিই।

এবারে বাটিকের মোম তৈরির পদ্ধতি জেনে নিই। বাটিকের কাজের জন্য বিভিন্ন অনুপাতে দুই ধরনের মোম এবং রজন ব্যবহার করা হয়। প্রুশিয়ান রং দিয়ে বাটিক করার সময় কাপড় বেশিক্ষণ পানিতে চুবিয়ে রাখব, তা না হলে ব্যবহৃত মোম কেটে যাওয়ার সম্ভাবনা বেশি থাকে। তাই রজন কিছুটা বেশি মেশাব।

মোম তৈরির অনুপাত জেনে নিই–

প্রুশিয়ান রঙের উপযোগী মোম

১। প্যারাফিন বা সাদা মোম আনুপাতিক হারে–৫০%
২। মৌচাকের মোম –২৫%
৩। রজন – ২৫%

পিতল বা এলুমিনিয়ামের পাত্রে চুলায় খুব কম আঁচে মোম গলাতে হবে। রজন, মোম গলে ভালোভাবে মিশে গেলে চুলার আঁচ আরো কমিয়ে দিব। চুলার উপর রেখে নকশা করা কাপড়ে গোল কাদাওয়ালা থালায় কাপড় লাগিয়ে মোম লাগাতে সুবিধা।

মোম লাগানো শেষ হলে প্রুশিয়ান বা ভ্যাট রঙে চুবিয়ে রং করতে হবে। অধিক রঙের কাপড় ভালভোভাবে ধুয়ে শুকিয়ে তারপর পরবর্তী মোম ও রং করব। এভাবে রং করা শেষ হলে কাপড় থেকে মোম তোলার জন্য একটা পাত্রে প্রয়োজনমতো গুঁড়ো সাবান দিয়ে কাপড়খানি সিদ্ধ করে মোম ছাড়িয়ে নেব। মোম ছাড়িয়ে পরিষ্কার পানিতে ধুয়ে ইস্ত্রি করে নিলেই মোম বাটিক হয়ে গেল।

কাপড়ের রং তৈরি

কাপড়ের রং করার নিয়মগুলো জানা প্রয়োজন। মোটামুটি তিনটি পদ্ধতির রং বাটিকে ব্যবহার করা যায়।

১। ভেট রং
২। প্রুশিয়ান রং
৩। ন্যাপথল রং

ন্যাপথল রং ব্যবহার একটু জটিল বিধায় শুধু ভেট রং ও প্রুশিয়ান রঙের পদ্ধতি জেনে নিই।

ভেট রং

একখানা শাড়ি বা সমপরিমাণ কাপড় রং করার জন্য নিচের পরিমাণে রং ও রাসায়নিক দ্রব্যের প্রয়োজন–

ভেট রং = ১ তোলা
হাইড্রোসালফাইট এন এক= ৪ তোলা
কস্টিক সোডা= ৪ তোলা

রং করার আগে কাপড় কমপক্ষে ৩০ মিনিট পানিতে ভিজিয়ে রাখব। এরপর পানি ঝরিয়ে নেব। পরে কাপড়ের পরিমাণে পাত্রে পানি দিয়ে তা চুলায় বসাব। রং ও রাসায়নিক দ্রব্যগুলো নেড়েচেড়ে ভালো করে মেশাব। পানি গরম হলে রংসহ জিনিসগুলো ভালোভাবে মিশে গেলে ভেজা কাপড়ের মধ্যে ডুবিয়ে ১৫/২০ মিনিট সিদ্ধ করব। কাপড় (টাই অ্যান্ড ডাই)

বাঁধা অবস্থায় পরিষ্কার পানিতে ধুয়ে ফেলতে হবে। ছায়ায় রেখে শুকানোর পর খুব ভালো করে সাবান দিয়ে ধুয়ে ইস্ত্রি করব। ভেট রং গরম করতে হয় বিধায় টাই অ্যান্ড ডাই পদ্ধতির জন্য এটা ব্যবহার করা হয়ে থাকে।

প্রুশিয়ান রং

একটি শাড়ি বা সমপরিমাণ কাপড়ের জন্য নিচের পরিমাণ রং, লবণ ও সোডার প্রয়োজন

১। প্রুশিয়ান রং –১ তোলা ২। লবণ –৫ তোলা ৩। কাপড় কাচার সোডা–১ তোলা

রং করার আধা ঘন্টা পূর্বে কাপড় ঠান্ডা পানিতে ভিজিয়ে রাখব পরে কাপড়ের পরিমাণে পানিতে পরিমিত ১ তোলা লবণ মেশাব। এনামেলের পাত্রে সামান্য গরম পানিতে ৩/৪ ফোঁটা এসিটিক এসিড দিয়ে প্রুশিয়ান রং মেশাব। রং ভালোভাবে মেশানো হয়ে গেলে লবণ মিশ্রিত পানিতে মিশিয়ে দিতে হবে এবং তাতে কাপড় ডুবিয়ে ভালোভাবে নেড়েচেড়ে দেখব যে কাপড়ের সর্বত্র রং লেগেছে কি না। ত্রিশ মিনিট পর আরেকটি বাটিতে সামান্য পরিমাণ পানি দিয়ে সোডাটুকু গুলে নিব এবং ডুবানো কাপড়ের রঙের সাথে ভালোভাবে মিশিয়ে নেব। সোডা মেশানোর পর আরো ত্রিশ মিনিট ডুবিয়ে রাখব। এরপর কাপড় তুলে নিয়ে ঠান্ডা পানিতে ধুয়ে চব্বিশ ঘন্টা ছায়ায় শুকাব। ভালো করে শুকানোর পর সুতার বাঁধনগুলো খুলে নেব তারপর সাবান দিয়ে ধুয়ে ইস্ত্রি করব। যে বাটিক পদ্ধতিতে ঠান্ডা পানিতে রং করা হয় সে পদ্ধতি অনুসরণ করব।

পাঠ : ১৮

ব্লক

কাঠে নকশা এঁকে নরুন দিয়ে খোদাই করে করে ব্লক ছাপার জন্য ব্লক তৈরি করা হয়।

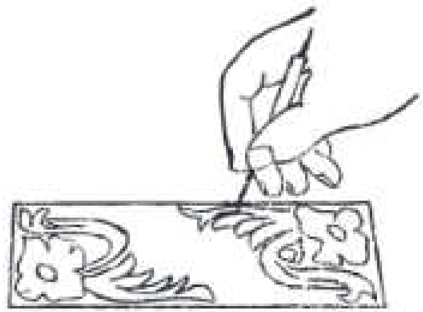

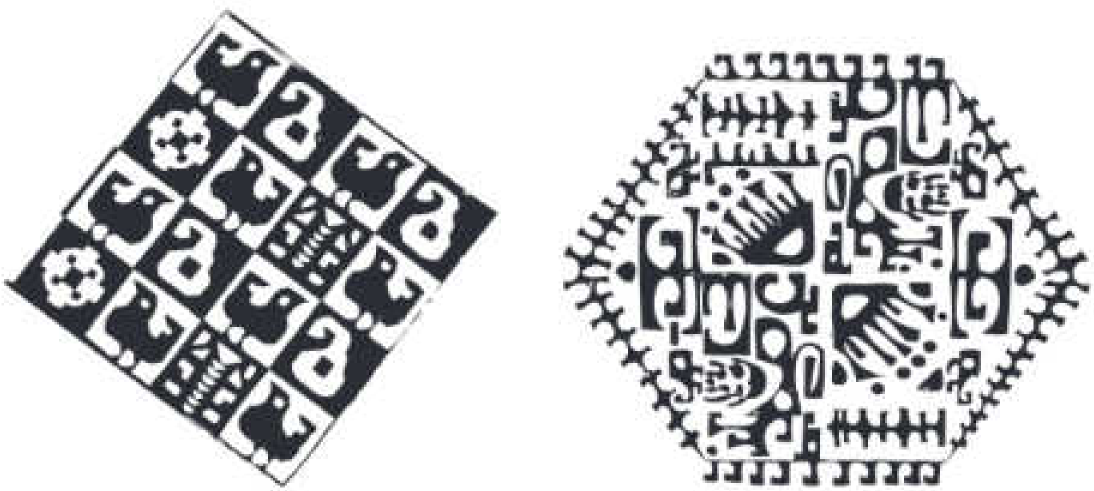

ব্লক প্রিন্টের নকশা

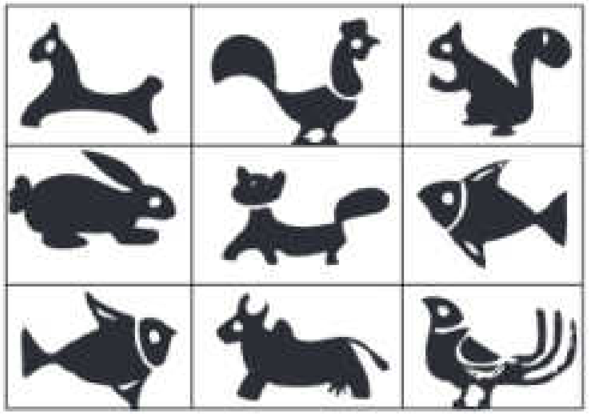

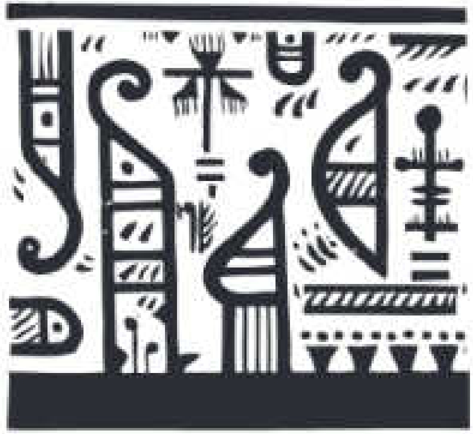

ব্লক প্রিন্ট

কাঠের ব্লক

পাঠ : ১৯, ২০

কাঠ খোদাই শিল্প

নরম কাঠের তক্তার উপর অথবা প্লাইউড নকশা এঁকে নুরুন দিয়ে খোদাই করে এটি তৈরি করতে হয়।

উপকরণ : হাতুড়ি, বাটালি /Carving বাটালি / Round বাটালি, প্লাস, করাত, চিকন বাটালি, শিরীষ কাগজ।

কাঠ খোদাই করে ছাপচিত্র শিল্পী : রুবাইয়া জামান রুবা

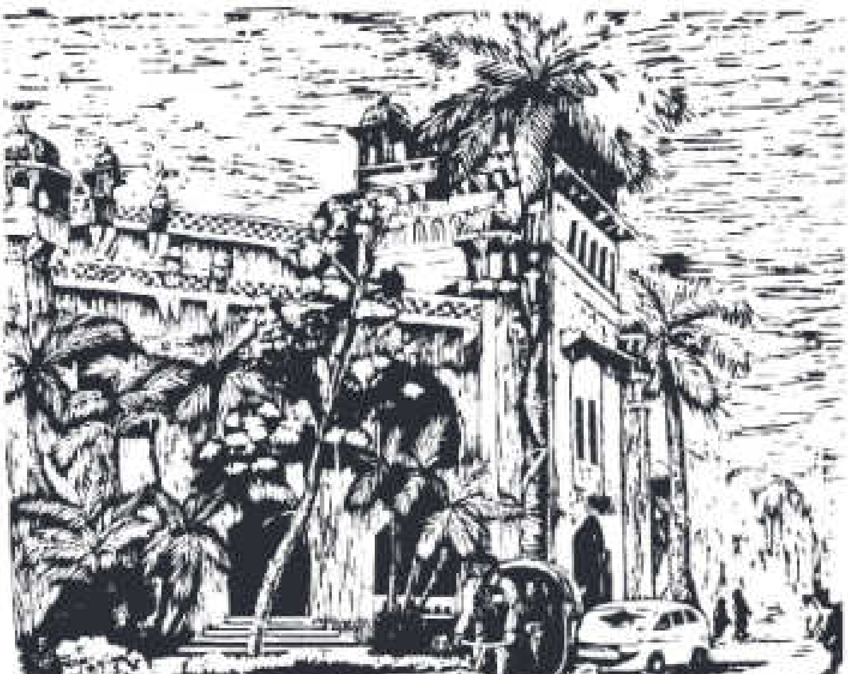

কাঠ খোদাই করে ছাপচিত্র শিল্পী : সঞ্জীব কুমার পাল

পাঠ : ২১ ও ২২

টেরাকোটা

পোড়ামাটির ফলকচিত্র বা টেরাকোটা

পোড়ামাটির ফলকচিত্র বাংলাদেশের আদি ঐতিহ্যবাহী লোকশিল্প এবং খুবই বিখ্যাত। মধ্যযুগে বিভিন্ন ভবন ও স্থাপনাতে বিশেষ করে মন্দির, মসজিদ ইত্যাদির দেয়ালে এ ফলকচিত্র ব্যবহার করা হতো। পোড়ামাটির ফলকচিত্র বা Terracotta হচ্ছে মাটির পাটাতনের বা ফলকের সমান জমিনের উপর ছবি বা নকশা উঁচু হয়ে থাকে এমন রিলিফ ওয়ার্ক। এটা বানানোর জন্য প্রথমে কাঁচা মাটি দিয়ে ফলকগুলো তৈরি করে তারপর পুড়িয়ে নেয়া হয়। তাই এগুলোকে বলে পোড়ামাটির ফলক। বগুড়ার মহাস্থান গড়ে তথা প্রাচীন পুন্ড্রনগরীর প্রত্নতাত্ত্বিক খননে বাংলাদেশের সবচেয়ে প্রাচীনতম ফলকচিত্র পাওয়া গেছে। মহাস্থানগড়ের এবং দিনাজপুরের কান্তজীর মন্দিরের ফলকচিত্রের বিষয়বস্তু নর-নারী ও দেবদেবী। অন্যদিকে পাহাড়পুর ও কুমিল্লায় ময়নামতির ফলকগুলোতে তৎকালীন সমাজ ও নিসর্গের ছবি পাওয়া যায়, বাঘা মসজিদের বা টাঙ্গাইলের মদিনা মসজিদের ফলকচিত্রের বিষয়বস্তুও ফুল, লতা-পাতা ও জ্যামিতিক নকশা, কিন্তু বর্তমানে আধুনিক বিভিন্ন বিষয় ও আকৃতি নিয়ে টেরাকোটা তৈরি হচ্ছে। বিভিন্ন অফিস ও বাসাবাড়ির অভ্যন্তরীণ সাজসজ্জা ও ভবনের বাইরের সৌন্দর্য বৃদ্ধির জন্য এখন প্রচুর টেরাকোটা ব্যবহার করা হচ্ছে। মাটির স্ল্যাব তৈরি করে তাতে মাটি কাটার বিভিন্ন আকৃতির টুলস দিয়ে খোদাই করে করে টেরাকোটা তৈরি করা হয়। মাটি দিয়ে তৈরি করে ছায়ায় রেখে কিছুদিন ভালোভাবে শুকাতে হবে। এরপর তুষের আগুনে পোড়াতে হবে। অথবা যাদের বাড়ির পাশে কুমার বাড়ি আছে তারা কুমার বাড়ির চুল্লিতেও পোড়াতে পারব। ছবি দেখে আমরা অতি সহজেই এগুলো বুঝতে ও করতে পারব।

মাটির স্ল্যাব (Slab) তৈরি করা

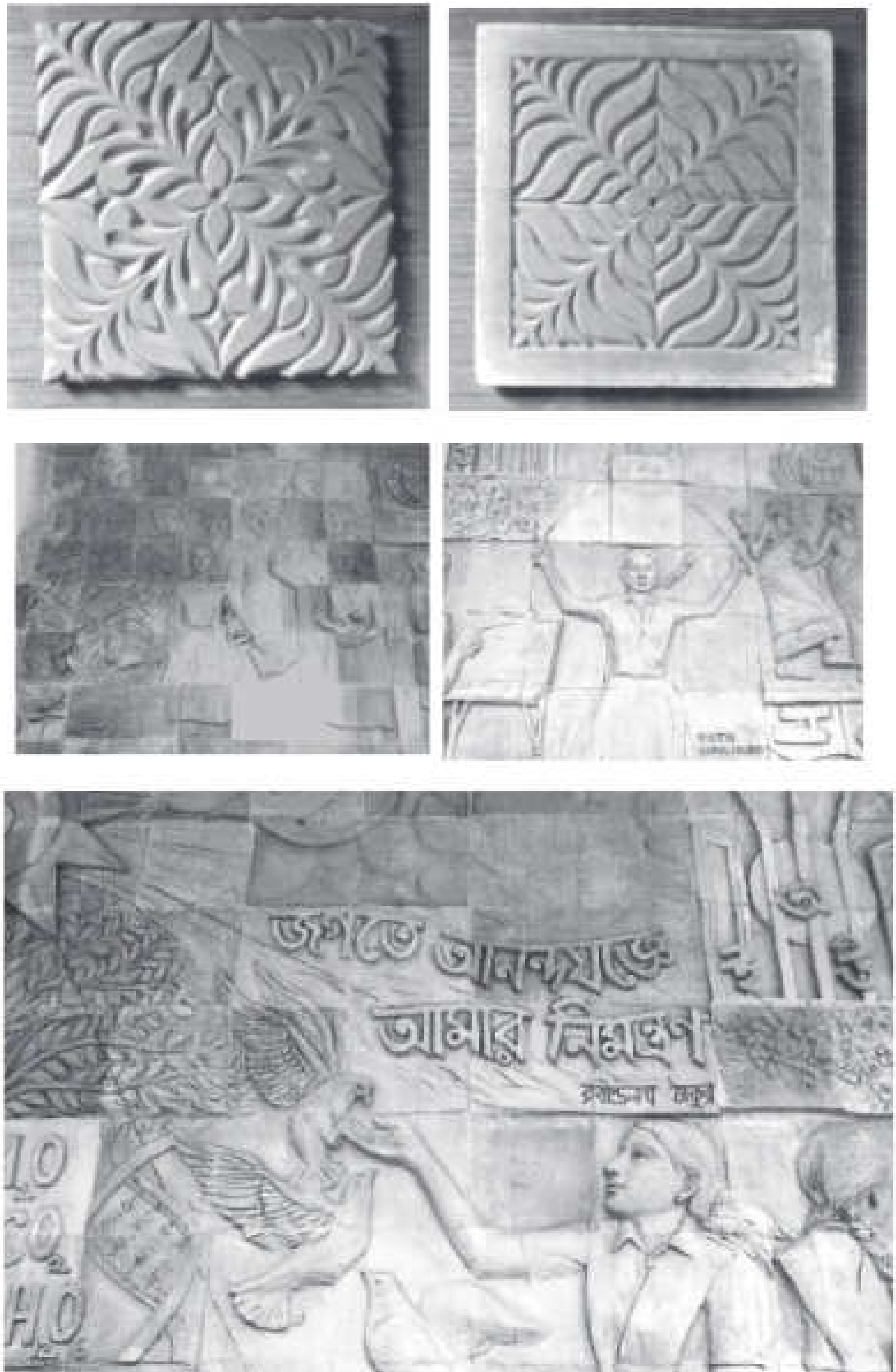

মাটির ফলকচিত্র (টেরাকোটা)

২০২৫

পাঠ : ২৩ ও ২৪

ফেলনা জিনিস দিয়ে শিল্পকর্ম

বিভিন্ন হাঁড়ি-পাতিলের ভাঙা টুকরা দিয়ে ছবি তৈরি

উপকরণ : ফেবিক আঠা, বিভিন্ন হাঁড়ি-পাতিলের ভাঙা টুকরা ইত্যাদি।

একটি প্লাইউডের টুকরা নিই। 2B পেনসিল দিয়ে প্লাইউডের উপর পছন্দমতো একটি ছবি আঁকি। এইবার প্লাইউডে ফেবিক আঠা লাগাই। বিভিন্ন হাঁড়ি-পাতিলের টুকরোগুলোর মধ্যেও ফেবিক আঠা লাগাব। এরপর টুকরাগুলো নকশা অনুসারে খুব সাবধানে বসাব। নকশার বাইরে যে অংশ আছে সেখানেও অন্য ধরনের টুকরোগুলো ফেবিক আঠা দিয়ে লাগাব। এভাবে অতি সহজেই ফেলনা জিনিস দিয়ে আমরা একটি মোজাইক ছবি তৈরি করতে পারি। (ছবি দেখে অনুশীলন করি)

হাঁড়ি–পাতিলের ভাঙা টুকরা দিয়ে
শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিনের প্রতিকৃতি

নমুনা প্রশ্ন

সৃজনশীল প্রশ্ন

অনুচ্ছেদটি পড়ো ও প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও (বাঁশ ও বেতের কাজ)

একটি প্রাইভেট টিভি চ্যানেল কর্তৃক সংগঠিত বৈশাখী উৎসব উদ্‌যাপনের জন্য তারা এক বিরাট মেলার আয়োজন করে। সেখানে নানাভাবে দিনটিকে পালন করা হচ্ছিল। বৈশাখ মাসকে নানাভাবে বরণ–করা হচ্ছিল। স্বপ্নিল ও শ্রেয়া তাদের মায়ের সাথে সেই মেলা দেখতে গেল। সেখানে তারা বিভিন্ন ধরনের, বিভিন্ন জিনিসের স্টল দেখতে পেল। সেগুলোর মধ্যে যে জিনিসটি তাদের বেশি আকৃষ্ট করল তা হলো বাঁশ ও বেতের স্টল। তারা সেখানে বাঁশের ফুলদানি, ছাইদানি, চালন, ছোটো ছোটো ঘর সাজানোর খালই, পুতুল ইত্যাদি। তাছাড়াও বেতের শীতলপাটি, নকশিপাটি ইত্যাদি দেখল। ওদের কাছে এগুলো খুবই ভালো লাগল এবং মায়ের কাছে বায়না করল ওগুলো কেনার জন্য যাতে তারা ঘর সাজাতে পারে। মা তাদেরকে বাঁশের দুটি পুতুল, ফুলদানি, ছোটো খালই কিনে দিল। এগুলো পেয়ে তারা মনের আনন্দে বাসায় ফিরল। কিন্তু দুঃখের বিষয় বাংলাদেশে এগুলোর প্রচলন দিন দিন কমে যাচ্ছে।

১। স্বপ্নিল ও শ্রেয়া কার সাথে মেলায় গিয়েছিল?

২। ওরা বাঁশ ও বেতের কী কী জিনিস দেখল?

৩। স্বপ্নিল ও শ্রেয়া বাঁশ ও বেতের জিনিস দিয়ে সাজিয়ে কীভাবে ঘরকে সুন্দর করতে পারে? উদ্দীপকের ভিত্তিতে তোমার মতামত ব্যাখ্যা করো।

৪। 'বাংলাদেশে এগুলোর প্রচলন দিন দিন কমে যাচ্ছে'– কীভাবে এগুলোর ব্যবহার বৃদ্ধি করা যায়–তোমার মতামত ব্যাখ্যা করো।

ব্যবহারিক (Activity)

১। বাঁশের একটি ফুলদানি তৈরি করো।

সৃজনশীল (কাঠের শিল্পকর্ম, টেরাকোটা)

রহিম ও রেজা একদিন তাদের বাবার কাছে বায়না ধরল তারা চারুকলায় যাবে। তারপর যেই কথা সেই কাজ। তাদের বাবা তাদেরকে চারুকলায় নিয়ে গেলেন। তারা সেখানে নানান ধরনের জিনিস দেখতে পেল। তারা সেখানে কাঠের ভাস্কর্য, শিল্পকর্ম, চিত্রকর্ম, উডকার্ভিং, পেইন্টিং, পাথরের ভাস্কর্য, টেরাকোটা, মোজাইক ছবি ইত্যাদি দেখল। রেজা খুবই অনুপ্রাণিত হলো এবং ভবিষ্যতে চারুকলায় পড়ার লক্ষ্য নির্ধারণ করল। সবকিছু দেখে তারা ঘরে ফিরল।

১। রহিম ও রেজা তাদের বাবার সাথে কোথায় গিয়েছিল?

২। তারা সেখানে কী কী দেখল?

৩। কাঠ দিয়ে কী কী তৈরি করা যায়? উদ্দীপকের আলোকে ব্যাখ্যা করো।

৪। কাঠ দিয়ে একটি ছোট পুতুল তৈরি করো।

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিকচিহ্ন (√) দিন।

১। টাই অ্যান্ড ডাই পদ্ধতিতে কাপড় ছাপাতে হলে নকশানুযায়ী প্রথমে–

ক. রং লাগাতে হয় খ. পানিতে ডোবাতে হয়

গ. মোম লাগাতে হয় ঘ. বেঁধে নিতে হয়

২। হলুদ, লাল, নীল এই তিন রঙের টাই অ্যান্ড ডাই পদ্ধতিতে কাপড় ছাপাতে হলে প্রথমে ব্যবহার করতে হয়–

ক. লাল রং খ. কালো রং

গ. হলুদ রং ঘ. সবুজ রং

৩। মোম বাটিক পদ্ধতিতে রং করতে হয়

ক. রং বেশি গরম করে খ. ঠান্ডা রঙে ডুবিয়ে

গ. অল্প গরম করে ঘ. ফুটন্ত গরম রঙে

মিল কর

বাঁশ দিয়ে	কাপড় রং করা যায়
প্রুশিয়ান রং দিয়ে	গরম মোম লাগাতে হয়
টাইডাই করতে কাপড়	ঝুড়ি, বাসাই তৈরি করা যায়
বাঁশের চটি বা শলা দিয়ে	ফুলদানি তৈরি করা যায়
বাটিক করতে কাপড়ে	সুতা দিয়ে বেঁধে নিতে হয়
বাঁশের অনেক সুন্দর	কাপড়ে এঁকে নিতে হয়
মাটির ফলকের	রং থেকে মুক্ত রাখার জন্য মোম লাগাতে হয়
নকশা ট্রেসিং করে	সামগ্রী তৈরি করা যায়
বাটিকে কাপড়ের অংশ বিশেষ	মাটি দিয়ে
ভেট রং দিয়ে	ঘরের সৌন্দর্য বাড়ায়
টেরাকোটা তৈরি হয়	কাপড় রং করা যায়

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১) কাপড় রং করার পূর্বে কীভাবে কাপড়কে রং করার উপযোগী করতে হয়?

২) টাই অ্যান্ড ডাই-এর রংকরণ পদ্ধতি লেখো।

৩) মোম বাটিক কীভাবে করতে হয়?

ব্যবহারিক (Activity)

১) একটি মাটির ফলকচিত্র তৈরি করো।

২) টাইডাই পদ্ধতিতে একটি জামা তৈরি করো।

রঙিন ছবি

জলরঙে ফুলের ছবি : শিল্পী হাশেম খান

জলরঙে 'মানুষ' অনুশীলন, শিল্পী : সুশান্ত অধিকারী

জলরঙে আঁকা 'মেলা' চিত্রকর্ম- মোঃ মিজানুর রহমান রতন, বয়স-১৪

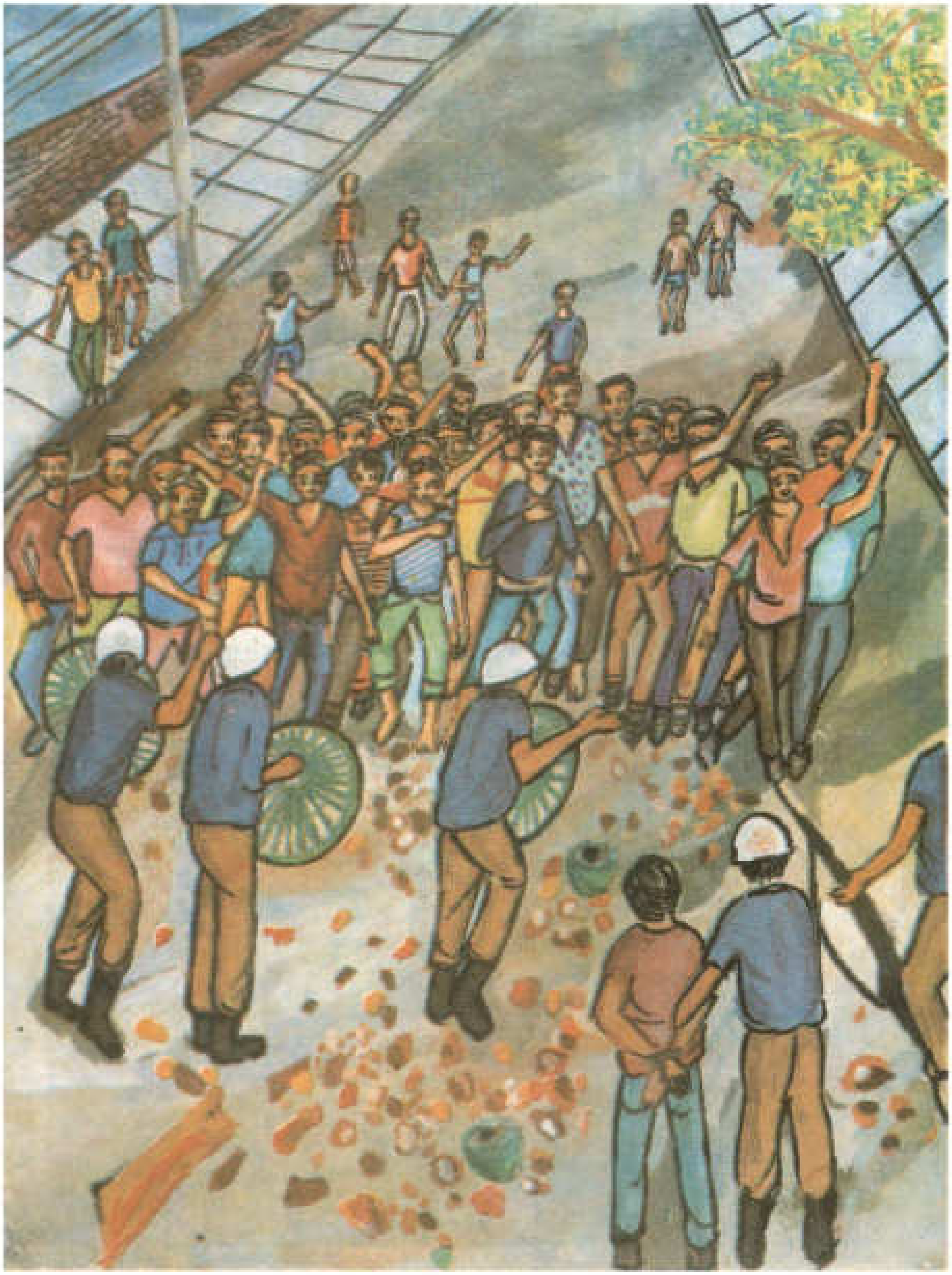

পোস্টার রং ও জলরঙে আঁকা 'আন্দোলন' এঁকেছে– তৃষা দাশ গুপ্তা বয়স– ১৪

জলরঙে আঁকা 'দাদার মুখ'; শিল্পী : আলাউদ্দীন তুষার

১৫০২

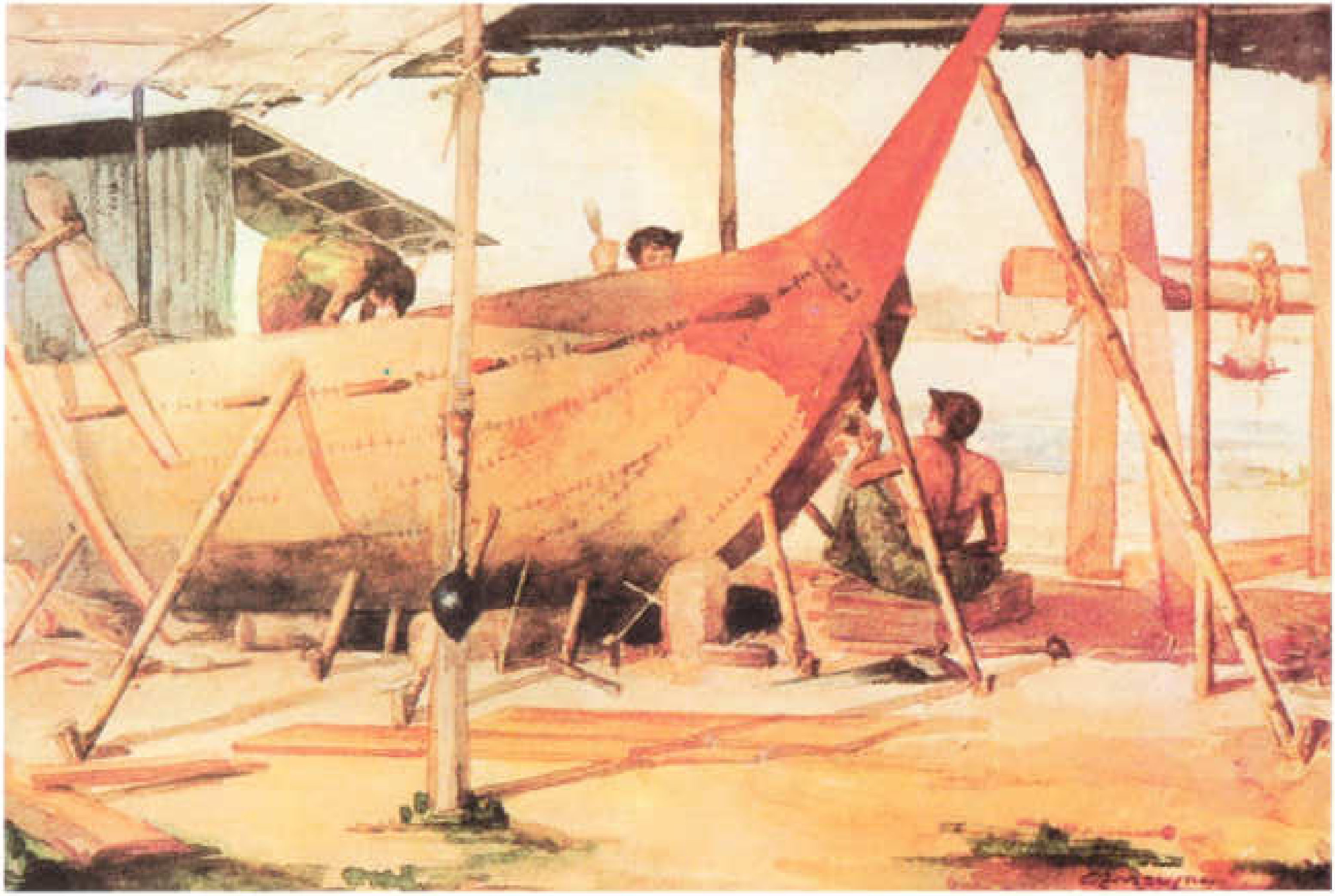

নৌকা তৈরি, জলরং মাধ্যমে আঁকা, শিল্পী : আবদুর রাজ্জাক, চারুকলায় ৩য় বর্ষের ছাত্র–১৯৫১

জলরঙে 'স্থিরচিত্র', এঁকেছে–প্রজ্ঞা পেশিয়া পাটোয়ারী, বয়স–১৪

ছাতার ওপরে অ্যাক্রেলিক রঙে ছবিটি এঁকেছে– অর্পিতা সাহা (অর্পা)

শিল্পী হাশেম খানের আঁকা জলরং ও পোস্টার রঙে চিল, বাচ্চাসহ মুরগি, মাছরাঙা, শালিক ও ঘুঘু

সমাপ্ত

২০২৫ শিক্ষাবর্ষ

নবম ও দশম : চারু ও কারুকলা

আমি জানি না বলতে শেখাই বড় শিক্ষা।

– হিব্রু প্রবাদ

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক বিনামূল্যে বিতরণের জন্য।